রুপোর বিছে
অধীর বিশ্বাস

রুপোর বিছে

অধীর বিশ্বাস

গীতাঞ্জলি প্রকাশনী
৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৯৩ এপ্রিল ১৯৮৬

প্রকাশক : শুভাশীষ বল
গীতাঞ্জলি প্রকাশনী

স্বত্ব : অণিমা বিশ্বাস

পরিবেশক : শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : অরুণ চট্টোপাধ্যায়

দাম : আট টাকা

মুদ্রাকর :
পাল প্রিন্টার্স
৬৬বি. মানিকতলা স্ট্রিট
কলকাতা-৬

শ্রীমতিউমারাণী বিশ্বাস

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বিশ্বাস

শ্রীচরণেষু

এই লেখকের

চোর, শালিখ আর ভূত
পরের মানুষ

রূপোর বিছে
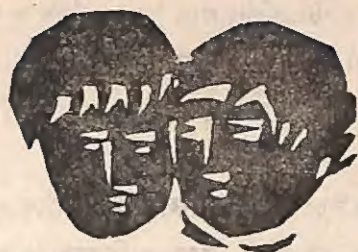
কদিন ধরে বেজায় গরম পড়ছে। রোজই মনে হয় আজ ঠিক বৃষ্টি হবে। কিন্তু হয় না। দোয়ার পাড়ের সোঁ সোঁ হাওয়া ঝাপটা দিয়ে বয়ে যায়। তারপর গাছপালা ঠাণ্ডা। অল্প অল্প নড়ে। ন্যুলো বাছুরের লেজ নাড়ানোর মতন। মা বলে, যাঃ। মেঘ কেটে গেল।

সকালবেলা রতন ফেনাভাত খাচ্ছে কাঁঠালতলা বসে। পাশে গর্তের উনুন। ওপরে নারকেল-পাতার ছাউনি-চালা। কালিঝুলি মেখে ডালটা একটু ঝুঁকে আছে পশ্চিমদিকে। অসিত উঠোনের পাশে কাঁঠালতলার দিকে এগোতে এগোতে বললো, কীরে, এখনো খাওয়া হয়নি? কখন স্কুলে যাবি? ফিরে এসে ক্লাশ ধরা যাবে?

রতন ভাতের কাঁখি ডিসের থালা থেকেকেঁখে তাড়াতাড়ি মুখে দেয়। বলে, ছাখ না। আমার সব রেডি। ওই যে ছাখ। বস্তাটস্তা সব বাঁধা সারা।

প্রথমে রবিদের কুটিরবাড়ি, তারপর বকুলফুলের গন্ধঅলা বাগান পেরিয়ে দোয়ার পাড়ে কচি ধানগাছের ফাঁকা হাওয়া। ওরা এখন খালপাড়ের রাস্তা ধরে জঙ্গলমুখো এগিয়ে চলে।

রতনের বগলে বস্তা। ডানহাতটা তাই বুকের কাছাকাছি থাকে।

অসিত বলে, এই রতন, তোর যে হাতে এঁটো লেগে রয়েছে।

রতন তাড়াতাড়ি প্যাণ্টে মুছে ফেলে।

—দিলি তো গা-টা এঁটো করে। কী পিশাচ রে তুই। যা, ধুয়ে আয় দোয়া থেকে। আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি।

—যে ভাত না খেলে একবেলা চলে না, তা নিয়ে অত বিচারের কী আছে?

অসিত রাগ দেখিয়ে বলে, তাহলে তুই আমাকে ছুঁবি নে।

—এই যে। রতন খপ করে অসিতকে ছুঁয়ে দেয়। বললো, হয়েছে তো?

অসিত মুখ ভার করে খাল পার হয়। কথা বলছে না কোনো। ধোপাবাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে রতন বলে, জানিস। এই বাড়ির কালীদা লটারিতে টেবিল-ঘড়ি পেয়েছে। কতো লোক দেখতে এসেছিলো। দেখবি, অসিত? —চল, কালীদার মাকে বললে দেখিয়ে দেবে।—কীরে, এখনো কথা বলছিস নে কেন?—ঠিক আছে। বাড়িতে তো আর জানে না। এঁটো ছিল, সেটা শুধু তুই-ই দেখেছিস। তাছাড়া আমিও তো বলে দিতে পারতাম। ওই যে, সেদিন গাঙকূলে···

অসিতের আগের কথাটা মনে পড়ে গেল। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললো, রতন। আজ অনেক দূর ঘুঁটে কুড়োতে যাবো। হাওড়ের ব্রিজ, মোটরবাস, পাকারাস্তা—সব দেখে আসবো।

—তাহলে বল, বাড়িতে বলে দিবি না!

অসিত হেসে বলে, ওরে না। বলে দিলে আর বন্ধু বলেছে কেন?
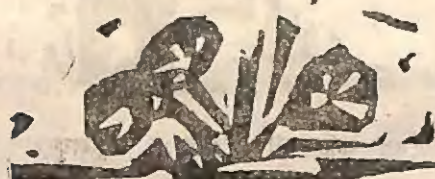
দূরের দিকে ধু ধু করছে খালি মাঠ আর মাঠ। কিছু ঝোপঝাড়, শনের ভুঁই। মাঠের দু'পাশ দিয়ে রাস্তা। বর্ষাকালে কাদা হয়ে গরুর গাড়ির চাকার গর্ত হয়ে যাওয়া পথ দিয়ে হাঁটতে গেলে কষ্ট হয়। জমির আলের পাশ বরাবর রাস্তা এগিয়ে গেছে কখনো খেজুরগাছ, কখনো তালগাছের পাশ দিয়ে। অনেকদূর দেখা যাচ্ছে বাগিচে। খড়ের গাদার মতন উঁচু আর গোল। এর মধ্যে ওরা দু'জনেই বস্তার মুখ খুলে নিয়েছে। যেতে যেতে যে দেখছে ঘুঁটে, সে সেটা তুলে কাঁধে ঝুলে থাকা বস্তার মধ্যে টুক করে ফেলে দিচ্ছে। কখনো তাড়াতাড়ি যাওয়া, কখনো আস্তে। এই ঘুঁটে কুড়োতে কুড়োতে গল্প হয়। দুই বন্ধুর গল্প।

জমিতে ধানের গাছ, পাটের ভুঁই। বাতাসে ঢেউ লাগছে গাছের চারায়। যেতে যেতে চোখে পড়ছে আমবাগিচে। ফ্যাগার সিঁদুরে আম প্রায় হাতের নাগালেই দোল খাচ্ছে। একটা ঢিল বা ডাল ছুঁড়ে মারবে কি ? রতনের ভাবগতিক দেখে অসিত বললো, রতন। খুব হুঁশিয়ার। ফ্যাগা ধারে কাছেই কোথাও আছে। জানিস তো ও বাড়ি যায় না। বাঁশের টঙ বেঁধে এই আম লিচুর সিজিনে বাগিচেয় ঘুমোয়। তাছাড়া ধরতে না পারলেও খুব গালাগালি দেবে। চল, যে কাজে এসেছি···

তবু রতন বলে, চল না। টুরে-আমতলা দিয়ে যাই। যদি এক আধটা পাই তো খেতে খেতে যাবো।

খুব গম্ভীর হয়ে যায় অসিত। বরোজের নিচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে।—তুই যা। আমি ওসবের মধ্যে নেই।

—আমরা তো আর গাছে চ্যাঙা মারছি না, যে ধরবে।

—না বাবা। আমি যাবো না।

—হুস, এতো ভয় তোর ?

—ভয় ভালো। তোমার মতন সাহস নেই।

—কেন রে, আজ অমন করে কথা বলছিস কেন ?

—কেন যে বলছি তা বুঝলে ফ্যাগার বাগানে যেতিস না।

অসিত বলে যায়। রতন শোনে। ত্বজনেই পাশাপাশি এগিয়ে যায় পাকারাস্তার দিকে।

অসিত বলে, একবার আমার দাদা আর রামা বাগানে আম কুড়োতে গেছিল। দাদারা হয়তো গাছে ঢিল দিয়েছিল আর ফ্যাগা টঙে বসে খুব বাজে গালাগালি দিয়েছিল। দাদা আর রামা মিলে ফ্যাগাকে টঙের বাঁশে বেঁধে রেখে দিয়েছিল। মুখ বাঁধা ছিল বলে চেঁচাতে পারেনি। শেষমেশ ত্ব'দিন বাড়ি যেতে পারেনি। তারপর বাড়ি থেকে খুঁজতে এসে দেখে ফ্যাগা একদম বন্দী। সে সব কথা বাবাকে বলে দিয়েছিল ফ্যাগা। সেই থেকে বাবা নিষেধ করে দিয়েছেন—যদি ফ্যাগার সীমানায় যাস তো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবো।—আমি যাবো না ভাই। তুই যা। আর এতে যদি ভীতু বলিস, তবু না।

এইসব গল্প করতে করতে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। ধারেকাছে কোথাও বাড়িঘর নেই। সোঁ সোঁ মোটর বাসের শব্দ চলে যাচ্ছে। রতনের আর বাগিচে কিংবা আম কুড়োনোর কথা মনে নেই। ত্ব'জনেই ঘুঁটে কুড়োয়। অসিত বলে, কীরে রতন, তোর যে বস্তা ভারি ভারি লাগছে!—যাই বলো তুমি কিন্তু খুব চালাক। আমি সেই থেকে বকবক করছি আর তুই টপাটপ ঘুঁটে কুড়িয়ে যাচ্ছিস। যখন ভর্তি হবে তখন বস্তার মুখ বেঁধে বলবে—যাই অসিত। স্কুলের বেলা হয়ে গেল।

রতন ঝপ করে বস্তাটা ফেলে দেয়। 'নে, যেগুলো বেশি মনে হচ্ছে তুলে নে। তোর মতন স্বার্থপর এই ছিরিমান নয়।—আর দেখেছিস অমন করে বাড়ি যেতে ?'

অসিত একগাল হেসে দেয়। হা হা করে হাসলে ওর পোকা দাঁতটা দেখা যায়। তখন খুব ভালো দেখায় ওর মুখখানা। বলে, তোর সঙ্গে ইয়ার্কি করছিলাম।—নে তোল।

—আর ওরকম করবি না বলে দিলাম। করলেই আড়ি।

দক্ষিণ মাঠ দিয়ে চরকা-ওড়ানো বাতাস বইছে। রোদ্দুরের তেজ এখনো ভালোমতন ওঠেনি। হাওয়া তাই ঠাণ্ডা।

অসিত বললো, আমাকে ও ভয় দেখাবি না। আড়ি দিয়ে আমাকে একঘরে করতে চাস তো? তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তোরা খেলায় না নিলে টাউনে চলে যাবো। হবিবর উকিলের ছেলে বাকু আমার বন্ধু, জানিস!

রতনের মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে যায়। বলে, না রে অসিত। ওভাবে বলিনি। চল।

মনে পড়ে, রতনের সঙ্গে সেবার কী একটা ব্যাপার নিয়ে সমরদার কথামতন সবাই আড়ি করে দিল। একা রতন। তার কোনো বন্ধু ছিল না। রাস্তাঘাটে দেখা হলে সবাই তাকে 'কালো ভূত' বলে খ্যাপাতো। পিছন দিক দিয়ে চিমটি কেটে পালিয়ে যেত। ঘর থেকে বেরোনোই যেতো না একদম। শুধু স্কুল আর চান করতে যাওয়া ছাড়া রতন বাইরে বেরোয় না। ওই দিনগুলো রতন খুব ভালো ছেলে হয়ে গেছিল। ভাইপো প্রশান্তকে নিয়ে বাড়ির উঠোনে সুপুরির খোলায় বসিয়ে ঠোঁট দিয়ে মোটর বাসের শব্দ করে টেনে নিয়ে বেড়াতো। সঙ্গে থাকতো ভোম্বল। ভোম্বলই রতনের একমাত্র বন্ধু হয়ে গেছিল। রতন ওর গায়ের ডাঁসপোকা বেছে দিত। আঁটালু তুলে দিত।

এর মধ্যেই রতনের মা মারা যান। ওর মাকে যখন উঠোনে নামানো হয়েছে তখন পাড়ার সবাই এসেছিল। সমরদা বা তার সঙ্গে যারা যারা আড়ি করেছিল তারা কেউই আসেনি। তখন যদি আসতো তাহলে কান্নাটা একটু কম হোতো। কিন্তু মা তো সবাইকেই খুব ভালোবাসতো। নাড়ু, কাশি-পেয়ারা সবাই তো পেত—সে সব ভুলে গেল? উঠোনে দাঁড়িয়ে ওদের জেঠিমাকে একবারও কি দেখে যেতে পারতো না?—যাক। দরকার নেই। একাই ভালো। ওই সময়

তার মনে হয়েছিল মা যখন চলে গেলেন তখন এ পাড়ার কারো সঙ্গেই মিশবে না। কেননা মা প্রায়ই বলতো—বাজে ছেলেদের সঙ্গে না মিশতে। দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে না মিশতে। তাই সেদিন থেকে রতন ওদেরকে দুষ্টু আর বাজে দুটোই ভাবতে লাগলো।

বেঁকিবেড়ার পাশে প্রশান্তকে ঘাসের ওপর বসিয়ে গুলির দান দেয় রতন। এবার সে বাইরে বেরোতে পারে। এখন কেউ চিমটি কেটে দৌড় দেয় না। কালো ভূত বলে খ্যাপায় না। সমরদা বা সবাই আড়ি তুলে নেবার জন্য গাছপালাকে সাক্ষী রেখে, ওরা নিজেদের মধ্যে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো—এই অসিত। জিজ্ঞেস কর, আড়ি খুলবে কি না!

রতন কি আর বোঝে না? সে ওদের ওসব কথাবার্তায় সাড়া না দিয়ে চলে আসতো। এতদিন কথা বলেনি আর এখন এসেছে! মা-ই যখন বাঁচেনি তখন দরকার নেই আড়ি খুলে। গুলির দান তুলে প্রশান্তকে কোলে নিয়ে বলতো—চল্ বাবু। আমরা বাড়ি যাই। এখানে থাকবো না।—সেই দিনের কথা মনে পড়লো এখন। খুব খারাপ লাগছে। আবার মাকে নতুনভাবে মনে পড়ছে। এ কি চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে যে!

অসিত যেতে যেতে বলে, ওই দ্যাখ। চকচকে মতন কী একটা চলে যাচ্ছে।

রতন চেঁচিয়ে বলে, ওই তো পাকা রাস্তা। মোটরবাস যাচ্ছে। —আমরা তাহলে হাওড়ের ব্রিজ দেখতে পাবো। নারান ঠাকুরের খাল দেখতে পাবো।

দু'পাশে মাঠ আর মাঠ। মাঝে পাকা রাস্তা। বেশ উঁচু। পাশ দিয়ে সারি সারি বটগাছ, পাকুড়গাছের ছায়া। রাস্তার ওপর বটফল পড়ে আছে। গাড়ির চাকায় চেপ্টেও আছে অনেক। ডালে ডালে শালিখ, বনটিয়ার কিচিরমিচির। পাশ দিয়ে বড়ো অলসভাবে গরুরগাড়ি চলে যাচ্ছে। প্যাঁক প্যাঁক। মোটরবাস

এখনও দেখা যাচ্ছে। অনেক দূরে চলে যাওয়ায় বেশ ছোট আর শব্দ খুব ক্ষীণ।

রতন বললো, যদি একটু আগে বলতিস ? তাহলে বাসের মতো লোকজন, ড্রাইভার, কনডাক্টর দেখতে পেতাম। রতন ঘুঁটের বস্তাটা কাঁধ থেকে নামায়। নামিয়ে পাকা রাস্তায় একবার পায়ের পাতা দিয়ে, পা বসিয়ে বসিয়ে কিছুটা হেঁটে যায়। বসে পড়ে আঙুল, হাতের তালু দিয়ে পাকা রাস্তার শানে হাত বুলোয়। এই রাস্তা দিয়ে কতবার কতো বাস যায়। ঘোড়ার গাড়ি টকাস টকাস ছুটে চলে। আর এমন রাস্তা হলে কত তাড়াতাড়ি স্কুলে যাওয়া যেত। কী সুন্দর আর প্লেন। এতটুকু উঁচু নেই। 'অসিত এই রাস্তা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে রে ?'

কোথায় আবার ?—হাওড়ের ব্রিজ, গোপালপুর, ঝিনেদা, যশোর।

—তারপর ?

—তারপর কি ছাই জানি ? —অনেকদূর। ধর ঢাকায়।

—ঝিনেদা মানে সেই দুধে-আইসক্রিমের জায়গা।

হ্যাঁ রে। আমার মামাবাড়ি তো ওখানে। একটু এগোলেই আইসক্রিমের কল। ওই যে পান-খাওয়া একটা লোক হাটে এসে ঠোঁট বাঁকা করে ডাক ছেড়ে বলে, আয়েসক্রিম। দুধঅলা, মালাই আয়েসক্রিম !—সেই লোকটা ঝিনেদার লাক। আমার মামাদের চেনে। এই রাস্তা দিয়ে মোটরবাসে আসে।

—তাহলে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি এর ওপর দিয়ে সেই আইসক্রিম যায় ?

—হ্যাঁ।

রতন আবার হাত তুলে উল্টেপাল্টে রাস্তার ওপর বসে কী যেন বুঝতে চায়।

—রতন, সরে আয়। লরি আসছে। ওই যে প্যাঁক দিচ্ছে ! রতন সরে আসে। এসে দু'জনেই বস্তাটা তুলে নেয়।

রতন বলে, হাওড়ের ব্রিজ দেখতে যাবি না?

—যাবো। তাহলে কিন্তু স্কুলে যেতে পারবি না।

—ছেড়ে দে। একদিন না গেলে কিছু বলবে না। তাছাড়া রোজ রোজ তো হাওড়ের ব্রিজে আসা যাবে না।

—দ্যাখ অসিত, ঠিকঠাক চিনতে পারবি তো?

—পারবো না মানে? আমি কতবার মামাবাড়ি যেতে গিয়ে দেখছি না? এই ব্রিজে বাস ওঠার আগেই মা বলে দ্যায়—এইবার হাওড়ের ব্রিজে উঠছি। নিচে নারান ঠাকুরের খাল।

—যে নারান ঠাকুরের খাল কেটে দিলে গাঙে জল ভরে যায়, সেই খাল?

—হ্যাঁ।

—তাহলে চল।

—যদি বাড়িতে বকাবকি করে স্কুলে না গেলে?

—তখন বলবো, এতো ঘুঁটে আনতে গেলে কতদূর যেতে হয়েছে বলো তো!—এসব বললে কিছু বলবে না।

—কিন্তু আমার বাবা তো বলবে স্কুল কামাই করে অমন ঘুঁটে কুড়নোর দরকার নেই। —তবু চল, গিয়ে বলবো পেটে ব্যাথা করছিল।

—অসিত, ওগুলো কীসের চালা রে?

—ওই তো হাওড়ের হাট। অসিত বললো।

রতন বলে, ওখানে হাট বসে?

—হ্যাঁ।

—আমাদের মাগরোর হাটের কতো ছোট।

—ছোট হবে না? আমাদের হাটে কতো লোক আসে। নৌকোয় আসে। গরুর গাড়িতে আসে। আর এটা ছোট্ট গ্রাম।

—এখানে পদ-মাস্টার ঝাঁকা করে মনোহারি দোকান সাজিয়ে আনেন। মনে পড়ে রতনের, পদ-মাস্টার তাকে পড়াতে এসে এতটুকু

দেরি করেন না। বারান্দায় উঠে নিজেই বস্তা পেতে নেন। কেননা রতন দেখেছে, তাকে পড়িয়ে-টড়িয়ে কিছুক্ষণ বাদেই মাস্টারমশাই দোয়ার পাড়ের রাস্তা দিয়ে ঝাঁকা মাথায় দোকান নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন। এমন যাওয়া মানেই হাওড়ের হাট ধরা। এই দোকান মাথায় যখন বাড়ির পাশ দিয়ে যান তখন পাশাপাশি যেতে ইচ্ছে করে। একদিন বলেই দিয়েছিল রতন। মাস্টারমশাই বলেছেন, মন দিয়ে পড়াশুনো করো, ঠিক নিয়ে যাবো। রতন এখন একদম ফাঁকি দেয় না মাস্টারমশাইয়ের কাছে।

কিন্তু সেই হাটের কাছাকাছি যে এইভাবে চলে আসবে ভাবতেই পারেনি।

—অসিত, নেমে যাবি?

—গিয়ে কী করবি? শুধুই তো চালাঘর। এখান থেকেই তো দেখা যায়।

—চল। যেতে ইচ্ছে করছে।

—তবে চল।

ওরা পাকা রাস্তা থেকে নিচে নেমে যায়। হাট থেকে কিছু দূরে একটা কুঁড়েঘর। গরুর গোয়াল। একটা বাছুর বাড়ির পাশে তিড়িং তিড়িং ছুটে বেড়াচ্ছে। আবার থামছে। আবার যখন মন চাইছে তখনই গলা উঁচিয়ে চার পা লাফিয়ে ছুট দিচ্ছে। এছাড়া মাঠে মাঠে সবুজ লতা। সবজি খেত। পাশেই তরমুজের খেত। উঁচু জমিতে খড়ের ওপর সব তরমুজ বসানো রয়েছে। বড় বড় বাড়ি পড়ে আছে। জমিটার মাঝখানে একটা খোকা কাকতাড়ুয়া ছেঁড়া জামা গায়ে দাঁড়িয়ে তরমুজের খেত পাহারা দিচ্ছে। ছোট হাঁড়িতে চুন লাগিয়ে চোখ মুখ আঁকা। হাওয়ায় জামাটা পৎ পৎ উড়ছে। দেখলে মনে হয় ওদের দেখে কাকতাড়ুয়াটা হাসছে। রতন ওকে দেখেই বলে, কী রে? আমাদের চিনিস? বল তো আমরা কারা?
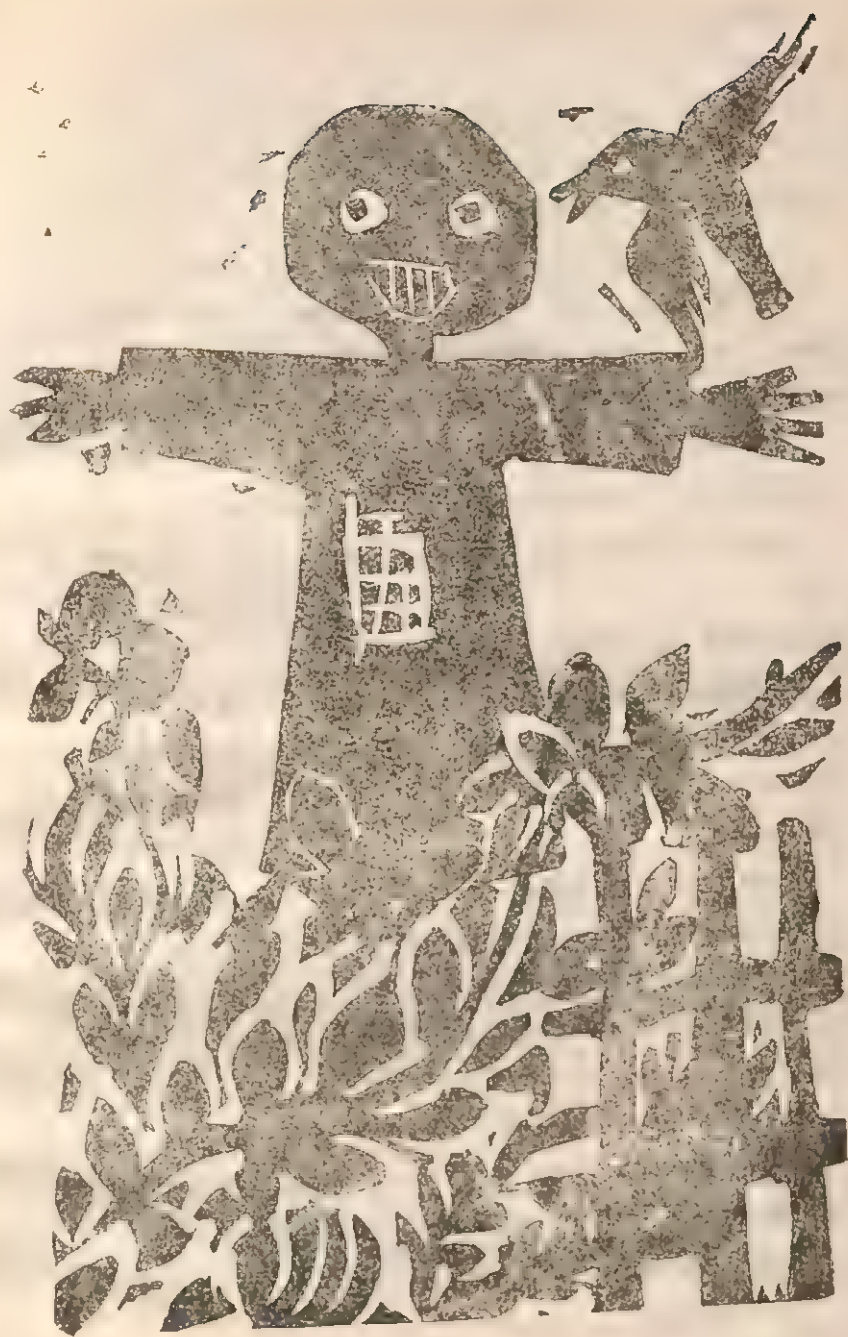
অসিত এদিক ওদিক তাকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তরমুজের ভুঁইতে ঢুকে যায়।

—অসিত। লোক এসে যাবে। শিগগির চলে আয়।

—দেখছিস না, ওর জামাটা হাতা থেকে বেরিয়ে পড়েছে। একটু দাঁড়া। ঠিক করে দিয়ে আসি।

রতনের কেমন ভয় করে। 'যদি তরমুজওলা এসে পড়ে!'

—অসিত চলে আয়। মোটরবাস আসছে। এক্ষুনি ব্রিজে উঠবে। আমরা পাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলবো। দেখিস, দাঁড়িয়ে যাবে।

রতন এমন অনেক ফন্দি বের করে অসিতকে বাইরে আনার জন্য। কিন্তু আসে না। বলে, হয়ে গেছে। এবার মাথাটা ঠিক করে দিই।

আসার পথে অসিত খেত থেকে একটা পাকা বাঙি গাছসুদ্ধ তুলে দেখায়।

বাঙিটা পেকে ফেটে গেছে।। 'রতন, তুলে আনবো?'

—অসিত। এমনভাবে রতন চেঁচিয়ে ওঠে যে এক্ষুনিই বুঝি ও কেঁদে ফেলবে। ওরে চলে আয়। দেখে ফেললে আমাদের ধরে নিয়ে যাবে। ঘুঁটের বস্তা ফেলে দেবে খালের জলে। দরকার নেই। তুই চলে আয়।

অগত্যা চলে আসে অসিত। ওর ইচ্ছে নয়, তবু চলে আসছে। আসার সময় তরমুজের পাতা সরিয়ে পাতার ভেতর লুকিয়ে থাকা তরমুজ দেখে।

রতন আবার তাগাদা দেয়। 'অসিত, ওই দ্যাখ, একটা লোক আসছে।'

যখন অসিত বেরিয়ে এলো তখন মোটরবাস চলে গেছে ব্রিজ ছাড়িয়ে। দু'একজন লোক নেমে গেল। নেমে মাঠের পাশ দিয়ে গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছে।

—একটা তরমুজ তুললে কিছুই হতো না। কতো তো রয়েছে জমিতে।

তুই শুধুমুধু ভয় পাস।

—কী দরকার, তুই কি খাস না?

—কিনে খাওয়া আর চুরি করে খাওয়ার মধ্যে আলাদা একটা মজা আছে।

—চুরি কারে খাওয়া? রতন অবাক চোখে তাকায়।

—চুরি ঠিক না। মনে কর নষ্টচন্দ্রের রাত্রিতে চুরি করছি। নষ্টচন্দ্রে নিলে তো আর সেটাকে চুরি বলে না।

—তা বলে না। কিন্তু তাহলে তো রাত হওয়া চাই। আর যাই চুরি কর তার অর্ধেক তো গেরস্তের জমিতে কেটে রেখে আসতে হয়।

রতন ঠিকই বলেছে। নষ্টচন্দ্রের রাতটার জন্য সারা বছর কীভাবে প্রস্তুত হয় গ্রামের ছেলেরা! কবে কোন্ তারিখে নষ্টচন্দ্র! ছেলেরা সারারাত বাগান. ঘরের কানাচি লুকিয়ে হাতে ছুরি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওই দিন এলে ফর্সা ছেলেও কালো হয়ে যায়। বাগানে ফেলে দেওয়া হাঁড়িকুড়ির কালি চোঁচ দিয়ে চেঁছে সর্ষে তেল দিয়ে অল্পবিস্তর সারা গায়ে মেখে নেয়। রাত আর গায়ের রঙ একদম মিশে যাবে। চুরি করতে গিয়ে পাড়ার কোনো কুকুরই ডেকে উঠবে না। কেননা সব কুকুরকেই নাম ধরে ডাক দিয়ে এগিয়ে গেলে একদম চুপ। এদিন চুরি করলে কেউ কাউকে দোষ দিতে পারবে না। নালিশ টিকবে না। তারপর সারারাত ধরে যার যে ফল খেতে ইচ্ছে ছিল তা খেয়েদেয়ে ভোরবেলা নবগঙ্গা বা দোয়ার ঘাটে গিয়ে চান করে নিলেই সব ঠিক। তাই দুষ্টু ছেলেরা কোনো বাড়ির কিছু পাড়তে গিয়ে বাধা পেলে নষ্টচন্দ্রের নাম করে শাসিয়ে আসে।

আকাশে রোদ্দুর এখন ভালোই উঠেছে। তাছাড়া কাঁধের ঘুঁটের বস্তা এতক্ষণ টেনেটুনে ব্যাথা হয়ে গেছে। বস্তা ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে দুই কাঁধই চুলকোচ্ছে।

চালার চারটে খুঁটি, শনের চাল। দাঁড়ালে মাথা ঠেকে যায়। এমন চালা গুণতিতে প্রায় ৫০।৬০ খানা হবে। লোকজন ছাড়াই ওরা

ছু'জন হাটের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। কখনো হাটের পাড়-বাঁধানো ঢিবিটার ওপর গিয়ে দাঁড়ায়। নজর করে দেখে জায়গাটা। ওখানে কীসের দোকান বসতে পারে! মাটির ফাটাফুটি জায়গা দেখে আর ভাবে—এখানে কি লবণ বিক্রি হয়? পান, নাকি তরকারি? রতন এমনভাবে চোখ রেখে ঘোরে মনে হয় বুঝি সে হাটের মধ্যে ছোট্ট তল্লা-বাঁশের মাথায় লম্ফ বেঁধে হাটুরেদের ভেতর দিয়ে নিয়ে যায়। হয়তো এখানে পেয়ে যাবে কারো হারানো পয়সা। লঙ্কা, পেঁয়াজ। মাগরো-হাটে তোয়েবের মতন তারও কাঁধে বুঝি অমন একটা থলে ঝুলছে। যার ভেতর কুড়নো আনাজপাতি। টাকাটা সিকিটা জমা হচ্ছে। হাটের শেষে কোনো এক ছাপড়ার তলায় বসে লম্ফের আলোয় সেগুলো বেছে আলাদা আলাদা ছোট ছোট থলেয় ভরে তারপর বাড়ি যাবে। ঘুরতে ঘুরতে নিজেকে তোয়েবের মতন মনে হচ্ছে রতনের। বাড়িতে মা ছাড়া ওর কেউ নেই। তোয়েব তাই হাটে হাটে অমন করে হাট কুড়োয়। তোয়েবকে খুব ভালো লাগে। এই ছোট বয়সেও সে নিজে সংসার চালায়। চাল, আটা সব নিজে গিয়ে কিনে আনে। নিজের মতন বাজার করতে পারে। কিন্তু রতন তো পারে না। যখনই বাজার বা হাটে যাক, বাবাই কেনাকাটি করেন। রতন শুধু হাটের এক চেনা দোকানদারের পাশে বসে থেকে সদাইয়ের ঝুড়িতে হাত দিয়ে বসে থাকে। এটা তার একদম ভালো লাগে না। কবে যে বড়ো হবে আর তোয়েবের মতন নিজের ইচ্ছেয় হাট করতে পারবে! তখন বাবার মতো কোমরে পয়সা থাকবে। একটাকার নোট ভাঁজ করা থাকবে। আর বাড়ি ফেরার সময় হাট থেকে তিলেখাজা কিনে আনবে। বাড়িতে এলে কানাই জিজ্ঞেস করবে—মণিকাকা, আমার তিলেখাজা!

অসিত ডাকে—রতন, চল। বেলা হয়ে যাচ্ছে।

রতন শুনেছে অসিতের ডাক। কিন্তু এক্ষুনিই ফিরতে মন চাইছে না। আর কিছুক্ষণ ঘুরতে পারলে ভালো হয়। হাটের মাঝে ঘুরতে
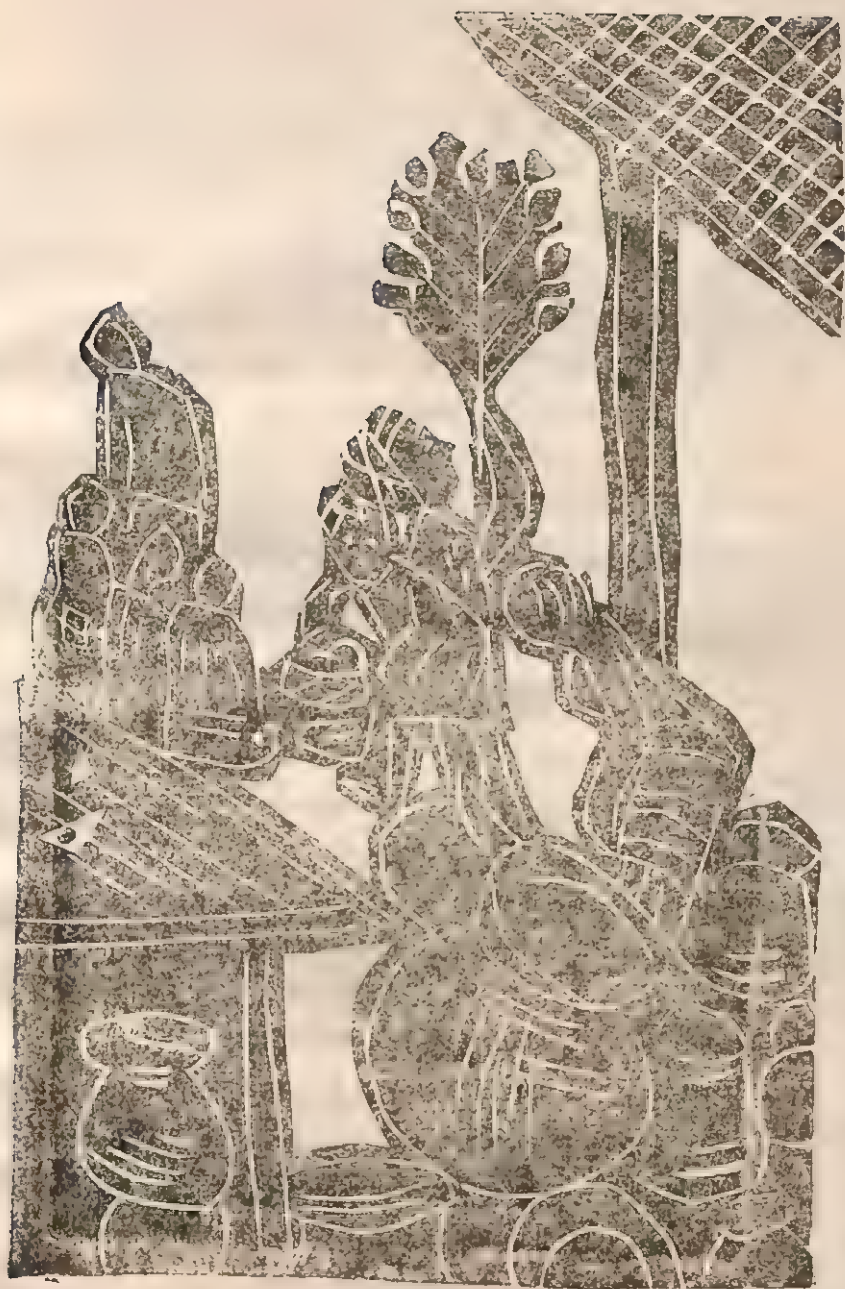
ঘুরতে কী সুন্দর একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আঁশটে গন্ধ, মশলা-পাতির গন্ধ, নতুন কাপড়ের গন্ধ। গুড়েহাটা থেকে যেমন একটা মিষ্টি মিষ্টি ভাপ বেরোয়,—তেমন। সব মিলিয়ে হাওড়ের হাট। ছোট্ট হাট। ছোট্ট জমাট গন্ধ। চালার তলায় চোখ বুঁজে দাঁড়ালে মাথার মধ্যে কেমন গমগম। হাঁড়ি-পাতিলে চড় মারার ঠন ঠন শব্দ রতনকে ঘিরে ধরেছে এখন।

অসিত উঠে পড়েছে। কাঁধে তুলে নিয়েছে ঘুঁটের বস্তাটা। রতনেরটা পড়ে রয়েছে পাশে। রতন ধীরপায়ে এগিয়ে আসে। ওই দেখা যায় ব্রিজ। রুপোলি হাওড়ের ব্রিজ। ওই সোজাসুজি ফাঁকা রোদ্দুরে এখন সোনার মতন, আগুনের মতন তাপ ঝুলে আছে। কেমন যেন ঝিমধরা, গনগনে তেজ। বেশিক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকলে বোঝা যায় রোদ কাঁপছে।

রাস্তায় উঠে একবার যেতে ইচ্ছে করছে, আবার করছেও না—এমনভাব। মনে হচ্ছে আবার একবার খালি পায়ে ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে আসে রতন। কিন্তু অসিত ওর আলিস্যি দেখে তাড়া লাগায়। 'রতন, বাড়ি চল। ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যাবে।'

রতন এই কথা শোনার পর কোনো উত্তর করলো না। দুই বন্ধু এখন পাশাপাশি পাকা রাস্তা ধরে এগিয়ে যায়। দু'পাশে বট-পাকুড়ের ছায়া রাস্তার ওপর বিছিয়ে আছে। যেতে যেতে ফাঁক দিয়ে যেটুকু রোদ এসে পড়েছে সেখানে পা পড়তেই পায়ে তাপ লাগে। আবার ছায়ায় চলে আসে। অসিত নিশানা মতন খোন্দলঅলা বটগাছের পাশ দিয়ে যে রাস্তা নেমে গেছে, সেই রাস্তার কাছে এসে বলে—নেমে পড়। যেতে যেতে যা হবে তাতেই বস্তা ভরে যাবে।

রতন বলে, ভরলে কী হবে! নিতে তো আর পারবো না।

—তবু কুড়ো। যতটা পারা যায়।—এই বলে ওরা আবার মাটির রাস্তায় নেমে পড়ে। দু'দিকে ছড়িয়ে গিয়ে ঘুঁটে কুড়োয়। শুকনো ঘুঁটে। যেগুলো একটু কাঁচা থাকে সেগুলো ওরা নিজেরাই

উল্টে দেয়।

রতন আর অসিত যখন পাশাপাশি হয়, তখনই দেখা যায় দুটো অল্প-বয়সী কিশোর। দড়িভরা প্যান্ট পরনে। খালি গা। রতনের গলায় মাদুলি। অসিতের প্যাণ্টের দড়ি ঝুল খাচ্ছে।

পু টিবিলের মধ্যেই বস্তা বেশ ভারি হয়ে উঠেছে। বেশিক্ষণ টানা যাবে না হয়তো। অসিত বস্তাটা এবার নামিয়েই রাখলো। রতন বললো, আমি আরো টানতে পারবো।

—শক্তি থাকে তুই টান। আমি এখানে রেখে কুড়োই।

রতনও ওর দেখাদেখি রেখে দেয় জমির আলে। বলে, আর দু'চারটে কুড়িয়ে তারপর চল। খুব খিদে পেয়েছে।

এইসব কথাবার্তার মধ্যে ভালো লাগছিল না আর। অসিত বললো, জল তেষ্টা পেয়েছে। এখানে কোনো বাড়ি আছে নাকি রে?

—এই মাঠে কোথায় পাবি? জল খেতে গেলে সেই কালী ধোপার বাড়ি যেতে হবে।

—তাই চল, রতন। আর পারছি না। —নে, বস্তা তোল। কালী ধোপার বাড়ি আসতে দুই জিরেন দিতে হলো। দুজনেরই কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। কপালের পাশে কানের লতির চুলগুলো ঘামে ভিজে উঠেছে। ওরা কালীদের কালা-আমতলার ছায়ায় এসে আবার একবার বসলো। অসিত বলে, রতন। তুই যা। তোর সঙ্গে তো চেনাশোনা আছে। একগ্লাস জল চেয়ে আন।

তেষ্টা নিয়ে রতন আর বেশি কথা বাড়ালো না। অন্যসময় হলে বলতো, তুই যা। —যা না।

কিন্তু এখন অসিতের চোখমুখ সত্যিই কেমন যেন লাগছে। ক্লান্ত ক্লান্ত। রতন তাই উঠে গেল।

কালী ধোপার একখানাই ঘর সামনে। পাশে কাপড়-কাচা পাট মাটির সঙ্গে উঁচু করে বসানো রয়েছে। পচা জল দিয়ে বুড়বুড়ি কাটছে। এসব পেরিয়ে বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে রতন ডাকে—কালীদা।

কোনো সাড়াশব্দ নেই। মাটির বাড়ি। শনের চাল। দরজায় টগর ফুল চুবিয়ে চালবাটা জলের ছোপ লাগানো। পাল্লা দুটো তাই আল-পনা আলপনা লাগছে। ঘরে তালা নেই। শিকল তোলা। কালীর মা ধারেকাছে কোথাও গেছে। রতন আবার ডাকে! এবার একটু জোরে। 'কালীদা, কালীদা।'

অসিত ওদিকে পাল্টা ডাক দেয়—চলে আয়। বাড়িতে কেউ নেই। চল, আমরা চলে যাই। আর তো এসে গেছি। বাড়িতে গিয়েই খাবো।

দোয়ার হাওয়ায় এসে দেখলো ধান গাছের চারাগুলো উদ্দাম ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। দূরে দেখা যায় পিরানী মা'র চালাঘর। বুনোপাড়া। ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়েঘর। রতন বলে, চল অসিত। ওই পাড়ার থেকে জল খেয়ে যাবো।

—তুই কী রে! জল খাওয়ার আর জায়গা পেলি না?

—কেন, কী হয়েছে?

—কী আর হবে! কতো নোংরা থাকে ওদের ঘরে। এঁটোর মানবিছ নেই। আমি খাবো না।

—জলে কোনো দোষ নেই। বইতে পড়িসনি, জলের অপর নাম জীবন! জলে কোনো পাপ নেই। চল্, কেউ জানবে না। শুধু তুই আর আমি। আমারও খুব তেষ্টা পেয়েছে।

অসিত যাবে না। কষ্ট করেই বস্তাটা তুললো। তুলে রতনকে না বলে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলো।

রতনের কেমন রাগ হয়! সেও কথা না বলে অসিতের থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে বাড়িমুখো চললো।

বুকুল ফুলের গন্ধ আসছে বাগান থেকে। কী দারুণ গন্ধ! রতনের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। ডাকে—অসিত, অসিত। শোন। একটা ভালো কথা আছে। এই অসিত···

অসিত আর ফিরে চায় না। উই দেখা যায় কুটির-বাড়ি, গাবতলা,
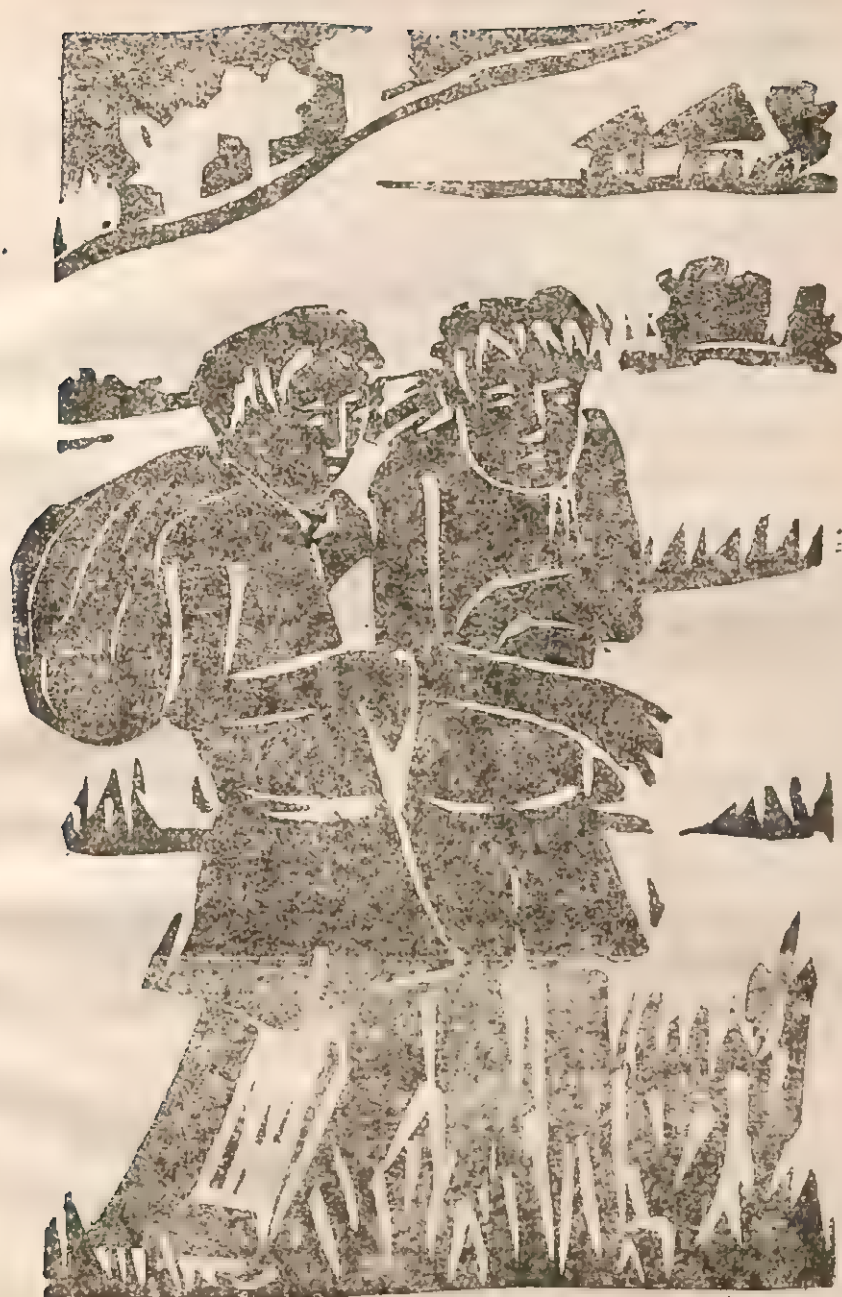
মালদাই আম। এটুকু পথ অসিতের সঙ্গে গেলে ভালো হয়। কিন্তু ও এতো রেগে গেল কেন? কথায় কথায় রাগ করা কি ভালো?

অসিতদের বাড়ি ওদের বাড়ির উত্তরপাড়ে। চারদিক এত জঙ্গল যে বাড়িটার চালটা মাত্র দেখা যায়। আর বোঝা যায় অসিতদের রান্নাঘরের পাশে যে বিরাট গাবগাছ, তাই দেখে। ও এতক্ষণ পৌঁছে গেছে ঠিক। রান্নাঘরের পাশে যে চালাটার তলায় সকালে বসে ফেনাভাত খেয়েছিল সেই জায়গা এখন গোবর-ন্যাতা দিয়ে লেপাপোছা। পাটের নুড়ির সরু সরু কাদার দাগ এখন শুকিয়ে গেছে। কয়েকটা ডেয়ো-পিঁপড়ে ব্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। ভোম্বল পাতাপুতির পাশে মুখ নিচু করে ঘুমোচ্ছে। সে একবার রতনকে দেখে ফের চোখ বন্ধ করে দিল। রোদের বেলা এখন একদম নেই। দুপুরের পর বিকেল হবার মুখে যে পিতলরঙা রঙ হয় রোদ্দুরের, তেমন করে দিনের রঙ হয়েছে এখন। দুপুরের খাওয়াও হয়ে গেছে নিশ্চয়। ভেতর বাড়ির উঠোনে দাঁড়াতেই মনে হলো কতোদিন বুঝি এই বাড়িতে আসেনি রতন। বাবা বাজার থেকে আসেননি এখনো। নইলে বউদি ঘরের বারন্দায় আঁচল বিছিয়ে ঘুমিয়ে আছেন কেন! কানাইও পাশে ঘুমোচ্ছে। বাবা বলে দিয়েছেন, আসতে দেরি হলে খেয়েদেয়ে নিও, বউমা।

ভাত নিশ্চয়ই ঢাকা আছে। কিন্তু তার আগে রতন সোজা কুয়োর দিকে চলতে থাকে। জল না খেলে একমুহূর্তও থাকতে পারবে না। আর কিছুক্ষণ থাকলে মাথাটা ঘুরে যাবে হয়তো।

বউদির দিকে একবার তাকায়। বউদি জেগে থাকলে তাকে খুব ভালো বলতেন। বলতেন, এতো দেরি কেন?—হাওড়ের হাট? ওরেব্বাস! সে তো অনেকদূর।

জল তুলে বালতির মধ্যেই মুখ চুবিয়ে দেয় রতন। নিঃশ্বাস বন্ধ করে গরু যেমন মুখ চুবিয়ে জল খায়, তেমন করেই। এক নিঃশ্বাসে অনেকটা। আঃ, ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!

বাবার ফিরতে অনেক দেরি হলো। দেরি মানে সেই বিকেল। বাবার শরীর ভালো নয়। এই কিছুদিন আগে অসুখ থেকে উঠেছেন। এক মাসের ওপর বিছানায় শুয়ে ছিলেন। অন্ন-পথ্য করার পর বাবা আজ কদিন হলো কাজে যাচ্ছেন। আগের মতন শরীরে বল পান না। নতুন বাজারে যেতেই পথে থলে নিয়ে তিন-চারবার জিরিয়ে নেন। মাথা ঘোরে নাকি। চোখের ভেতর অন্ধকার অন্ধকার লাগে। কিন্তু বাবা সকালবেলা বলে গেছিলেন, তাড়াতাড়ি ফিরবেন। লোকের কাছ থেকে আদায়পত্র করে এক দাঁড়ি চাল নিয়েই চলে আসবেন। কিন্তু রতন জল খেয়ে বারান্দায় আসতেই দেখে বউদি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন। পাশে কানাইও বউদির কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে। সে বউদিকে না ডেকে রান্নাঘরের দরজা খুলতেই কেমন যেন মনে হলো। মনে হলো—কই, পাতাপুতি জ্বাল দেওয়া হয়নি। মাটির হাঁড়িতে ভাত নামানোর পর উনুনের লেপা মাটিতে কালির দাগ হয়ে যায়, সে সব কিছুই নেই। তাহলে কি বউদি আজ রান্না করেননি? হাঁড়ির সরা তুলতেই ঘটাং করে শব্দ হলো।

আর কিছু দেখার ইচ্ছে করলো না রতনের। সে আবার দরজার শিকল তুলে দিয়ে বাড়ির উঠোনে একটু ঘোরাঘুরি করলো। গাছে পেয়ারার কুশি ঝুলছে। জামে সবে বেগুনি রঙ হচ্ছে। আম পাকার সময় তো বেশ দেরিতে। চারটে গাছের দুটোতে এবার একটাও বউল আসেনি। আর দুটোয় যে ক'টা এসেছে তা এখন পেড়ে এনে খাবার মতন নেই। রতন পশ্চিমঘরে ঢুকে এটা-ওটা সরিয়ে দেখলো কোথাও কিছু খাবার মতন আছে কি না। কিন্তু কিছুই পেলো না। খিদে বেজায় পেয়েছে। সে শুয়ে পড়লে বউদির মতন কানাইয়ের মতন তারও ঘুম আসবে কি? ঘুমিয়ে গেলে অনেকটা খিদে বাঁচানো যাবে।

রতন সেসব করলো না। সে কুয়োতলার পাশ দিয়ে শাকালুর থোকা থোকা বীজ সরিয়ে অসিতদের বাড়ি যায়।

অসিতের মা পিছন ফিরে অসিতের আনা ঘুঁটেগুলো তুলে রাখছেন। রান্নাঘরের দরজা খোলা। বাইরে থেকে দেখা যায় না কে খাচ্ছে। তবে এখন অসিতই হবে নির্ঘাৎ। রতন চুপি চুপি আরো কাছে গেল। মাছের মুড়ো চোষার চুস চুস শব্দ হচ্ছে। সামনে বসে থাকা বেড়ালটা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওই শব্দ শুনে মাথা তুলে দেখছে বারবার। রতন ডাক দেয়—অসিত।

অসিত মুখে ভাত রেখে কথা বলে। বললো, বোস। এক্ষুনিই হয়ে যাবে। উঃ, কী ঝাল হয়েছে।

রতন ঢোক গিলে বলে, কী মাছ রে?

—রামেশ্বর ট্যাংরা। দাদা ছিপ দিয়ে ধরেছে।

ওই যে বাবা। কিন্তু ওখানে কেন?

গৌরদের আমতলার ছায়া বাবাকে ঢেকে আছে। 'এ কী! বাবা যে পা দুটো ছড়িয়ে দিয়েছেন। রতন বাবার সামনে দিয়ে এক দৌড় বাড়ি ঢুকে গেল। 'বউদি, ও বউদি। দেখুন বাবার শরীর খারাপ হয়েছে আবার। গৌরদের আমতলায় বসে পড়েছেন।'

বউদি জেগে পড়েছেন অনেক আগেই। কানাই পাশাপাশি ঘুর ঘুর করছিল। রতনের কথা শুনে চমকে গেলেন। বউদি ছুটে যান। আগে আগে রতন। গিয়ে সে থলেটা আর ফুটো ফুটো ছাতাটা তুলে নেয়। 'আবার জ্বর হয়েছে, বাবা?' বউদি ব্যস্ত হয়ে বাবাকে তুলে ধরেন। রাগ করে বলেন—বললাম, দরকার নেই বাজারে গিয়ে। যেতে পারবেন না। বাবা কিন্তু বউদির কথায় একটুও রাগ করছেন না। বাবা বউদির কাঁধে বা হাতের ভর দিয়ে এগোচ্ছেন। সামনে রতন। কানাই ধরেছে দাদুর ফতুয়া। সবার মতন কানাইও কথা বলে।
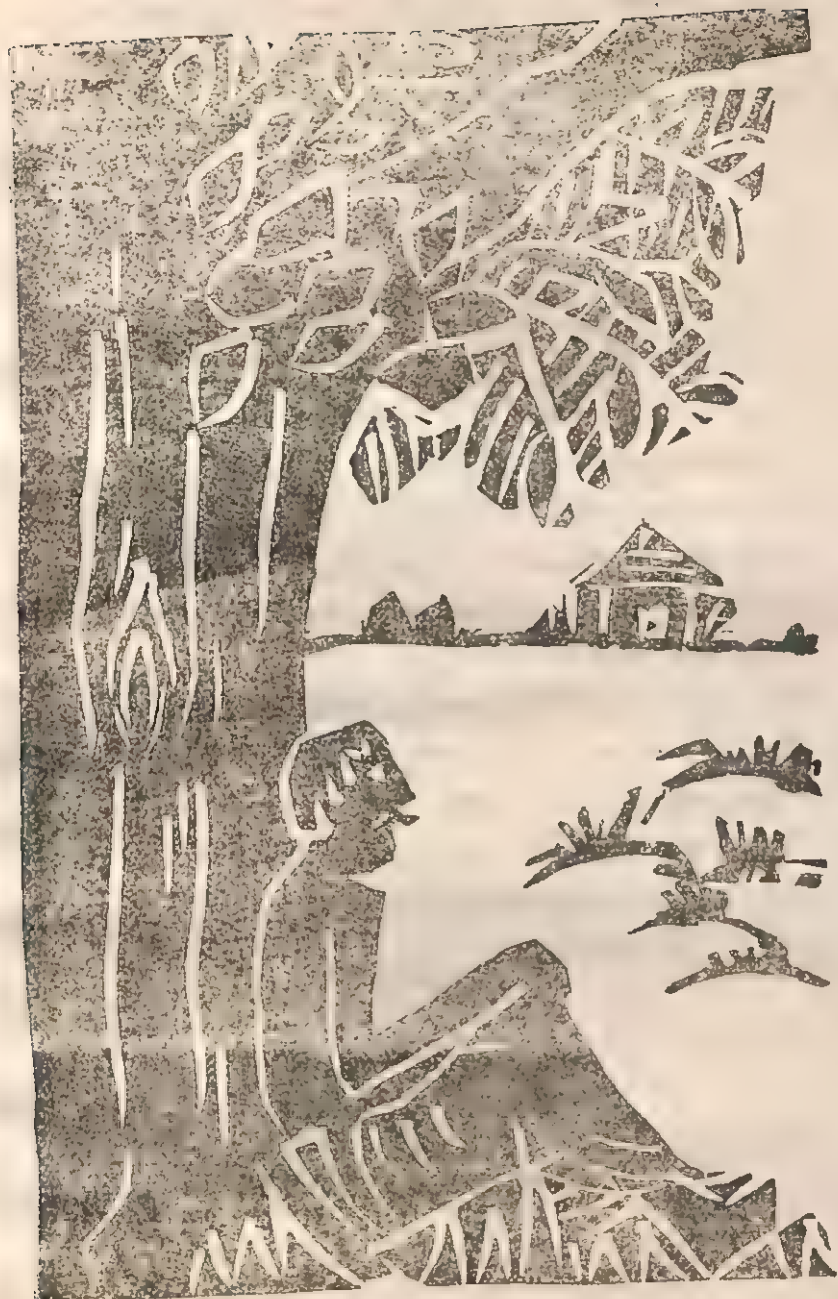
বললো, মণিকাকা ঘুঁটে এনেছে দাদু। জামাটা ছেড়ে দু'হাত বড়ো করে বলে, এই অ্যাতো। বাবা একটু হাসতে চেষ্টা করেন। কানাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, দাদুভাই!
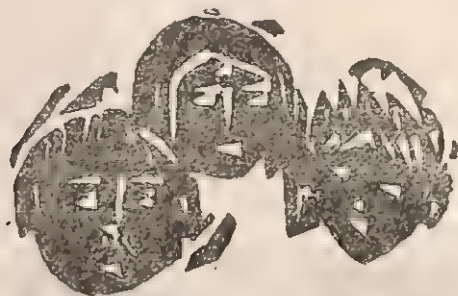
বড়দা কিছুদিন আগে যশোর গেছেন। ওখানেই থাকেন বড়দা। একটা কাপড়ের দোকানে কাজ পেয়েছেন। যাবার দিন বড়দা রাস্তায় বেরিয়ে কেঁদে দিয়েছিলেন! তাই দেখে কানাইও কাঁদছিল। রতন কেঁদেছিল। কিন্তু বুঝতে পারেনি তখন, কেন কাঁদছে। বাবা, বউদি চোখের জল মুছছিলেন ঘনঘন। সেটা দেখে সেও কেঁদে দিয়েছিল। বড়দা বলেছিলেন, কাঁদিসনে রতন। যেদিন আসবো সেদিন তোর জন্য নতুন জামাপ্যাণ্ট নিয়ে আসবো। রতনের মনে হয়েছিল তখন, দরকার নেই নতুন জামাপ্যাণ্ট। তার চেয়ে বড়দা যদি বাড়িতে থাকেন তাহলে ভালো হয়। কিন্তু বড়দা থাকেননি। ঘোড়ার গাড়ি করে বড়দা ঢাকা রোডের বাসস্ট্যাণ্ডে গেছিলেন।
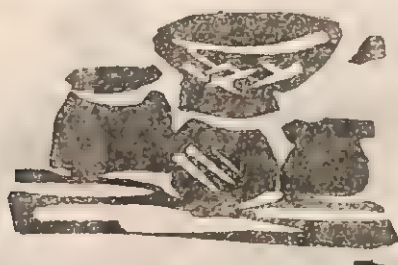
কতোদিন হলো বড়দা বাড়ি নেই। বাড়ি থাকলে বাবার আজ এতো কষ্ট হতো না। বাবার অসুখ করতো না। বড়দা থাকলে আজ ঠিক রান্না হতো। বড়দা কবে বাড়ি আসবেন?

রবিবারের হাটে সতীশ স্যারের সঙ্গে বাবার দেখা হয়ে গেল লঙ্কা-হাটায়। রতনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ আমাদের স্কুলে পড়ে না?

বাবা বললেন, হ্যাঁ।

—মনে পড়েছে। রতন বিশ্বাস। রোল নং ১৯।

রতন মিচকে মিচকে হাসছিল।

—ভালোভাবে পড়াশুনো করো কিন্তু। সামনে অ্যানুয়াল পরীক্ষা। হাফ-ইয়ার্লিতে তো বাংলায় ফেল করেছিলে।

এবার হাসি মিলিয়ে গেল ওর মুখ থেকে।

বাবা বললেন, খুব চিন্তার কথা, মাস্টারমশাই। কী করি বলুন তো? ও যে একদম পড়াশুনো করে না।

—উঁহু, এ তো একদম ভালো নয়।

—নিজের শরীর-গতিক ভালো না। ওর বড়দাও বাড়ি থাকে না। আর ওর বউদির কথা তো কানেই নেয় না।

সতীশ স্যার আগের মতনই মাথা নাড়েন। বলেন, এমন করলে তো পাশ করতে পারবে না।

—একটা ভালো মাস্টার জোগাড় করে দিন না। যা হোক কষ্ট করে পড়াই। ওর দাদা চিঠিতে লেখে, দেখবেন বাবা। রতনের পড়াশুনোর যেন কোনো অসুবিধে না হয়।

সতীশ স্যার থলেটা হাত পাল্টাপাল্টি করে বললেন, বছরের শেষ হতে চললো। এখন কোথায় মাস্টার পাবো। তার চেয়ে এক কাজ করুন, নারানদা। আমার ছেলের কোচিংয়ে দিন। নিতাই খারাপ পড়ায় না।—কী রে, পড়বি?

রতন আবার হাসে। মাথাটা কাত করে বলে, হ্যাঁ।

—তাহলে আমাদের বাড়ি গিয়ে পড়ে আসতে হবে কিন্তু। তোকে চারপার হয়ে যেতে হবে।

রতন বললো, আমি গাঙ সাঁতরে যাবো। বই আর জামাপ্যান্ট হাতে তুলে সাঁতরে পার হবো। তারপর তো একটুখানি।

—তুই সাঁতার জানিস ?

বাবা বলেন, পড়াশুনো বাদে সবেতেই ওস্তাদ, মাস্টারমশাই।

প্রথম দিন শুধু সতীশ স্যার নিতাই মাস্টার মশাইয়ের কোচিংয়ে নিজে নিয়ে গেলেন। বললেন, এই নে নিতাই। তোকে আর একটা গাধা মানুষ করতে হবে। আমাদের বটতলার নারানদার ছোট ছেলে।

নিতাই মাস্টারও নড়িহাটীর একটা স্কুলে মাস্টারি করেন। আগে অনেক দেখেছে। কিন্তু ইনিই যে সতীশ স্যারের ছেলে তা একদম জানা ছিল না। দেখতে সতীশ স্যারেরই মতন অনেকটা। এখন গরমকাল। তাই খালি গায়ে একটা তালপাতার পাখা নিয়ে যখন পড়াতে বসেন তখন বারবার লোম-অলা ভুঁড়িতে হাত বুলোন। বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারা।

রতন নিতাই মাস্টারের কোচিংয়ে ভর্তি হলো। সে গাঙ পার হয়ে পড়তে যায়। ফেরার পথে দু'জন বন্ধু পেয়ে যায়। চারপার হয়ে গল্প করতে করতে বাড়ি ফিরতে পারে। নিতাই মাস্টার উইকলি পরীক্ষার পর রেজাল্ট দেখে বললেন, কী রতন, তুমি কি বৃত্তি দেবে ?

বৃত্তি দেওয়া মানে তো ভালো ছেলে হওয়া। তার খুব ভালো লাগলো। বললো, হ্যাঁ, মাস্টারমশাই। দেবো।

—তাহলে একটা ছাত্রবন্ধু কিনে ফেলো। ছাত্রবন্ধু নয়তো ছাত্র-সুহৃদ। যে কোনো একটা হলেই চলবে।

বাড়ি এসে কথাটা বাবাকে বলতেই বাবা বললেন. ঠিক আছে। আমি কালই নিয়ে আসবো। সামনে অ্যানুয়াল পরীক্ষা। একসঙ্গে কী করে দুটো পরীক্ষার পড়া হবে ?

বৃত্তি দিলে এমনিতেই ক্লাশে তুলে দেবেন। তবে যারা স্ট্যাণ্ড

করে উঠবে, ফাস্ট সেকেণ্ড হবে মনে করছে—তাদেরই দিতে হবে।

—তাহলে তুই কী করবি ?

নিতাই মাস্টার তাকে খুব ভালোবাসেন। তাঁর বিশ্বাস রতন ভালো রেজাল্ট করবে। সেই জন্যেই তো বৃত্তি দিতে বলেছেন। রতন বললো, আমি স্কুলের পরীক্ষা দেবো, বাবা। স্নেহময়রাও যে দিচ্ছে।

—ঠিক আছে। মাস্টারমশাই যা বললেন তাই ক'রো।

রতন এবার বৃত্তি দেবে। বৃত্তি পেলে ফ্রিতে পড়া আর মাসে মাসে গরমেণ্ট পিওন পাঠিয়ে টাকা দিয়ে যাবে। সেই টাকা পেলে পড়ার জন্যে একটা চেয়ার-টেবিল কিনবে। বড়দা এলে সেই টাকা থেকে একটা স্যুটকেস আনাতে দেবে। বইপত্তর রাখার ভারি অসুবিধে। সবচেয়ে বড়ো কথা বৃত্তির টাকা দিয়ে পকেট-খরচা চলে যাবে। ভালোভাবে, মন দিয়ে পড়াশুনো করতে হবে। রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে হবে। বাবা বলেছেন ভোরবেলা পড়ার ওভ্যেস করতে। ভোরবেলাকার পড়া মনে থাকে। শুধু পড়লেই চলবে না, সেটা চোখ বুজে বলে যেতে হবে। নয়তো খাতায় লিখে তারপর বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে যদি দেখা যায় কোনো ভুল নেই তবেই সত্যিকারের পড়া। তখন কেউ আটকাতে পারবে না। স্ট্যাণ্ড করে পাশ করতে পারবে। রতন তাই আজ থেকেই পড়া শুরু করে দেয়। ওদিকে অমল, পরিমলদের মতন নতুন করে এ বাড়িতে ভোরে আর জোরে জোরে পড়া শুরু হলো।

এই ভোরে উঠে পড়ার ফলে কয়েকটা ব্যাপারে পরিবর্তন দেখা গেল। ভোরবেলা একটানা পড়ার পর বাবা বলেন, যাও। এবার একটু ঘুরে এসো।

যখন ঘুরতে যায় তখন রাস্তায় যার যার সঙ্গে দেখা হয় তারা রতনকে নতুনভাবে দেখে। রতন কতো ভালো ছেলে হয়ে গেছে। চলার সময় কোনো হুটপাট ভাব নেই। কেমন শান্ত, চুপচাপ হেঁটে যায় পথ দিয়ে। লোকদের তাকানো দেখে নিজেকে খুব ভালো

লাগে। তার মনে হয়—এরা কি একবারও বাড়ি গিয়ে বলবে না—দ্যাখগে, রতন কীভাবে পড়াশুনো করে! শিখে আয় ওর কাছ থেকে, যা।
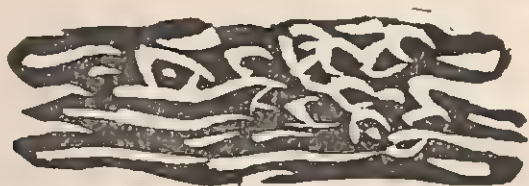
সকালবেলায় অসিত এসেছে। বস্তাটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। বাবা অসিতকে ঢুকতে দেখেই বললেন, আজ ও যাবে না। ওর পড়া আছে।

বাবার এই কথায় মনটা খারাপ হয়ে গেল রতনের। কতোদিন ঘুঁটে কুড়োতে যায় না। সে একবার বউদির দিকে ফিরে তাকায়। যদি বউদি একবার বলেন, ঘুঁটে নেই, তাহলে হয়তো বাবা 'না' করতে পারবেন না। কিন্তু বউদি সেসব কিছু বললেন না। চটপট এঁটো বাসন জড়ো করে উঠে পড়লেন।

অসিত মন-খারাপ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওর বেরিয়ে যাওয়া রতন কলার ডেগো ঘেরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখছে। অসিত চুপচাপ দোয়ার দিকে চলে যায়। একবার ইচ্ছে হলো গিয়ে বলে, দাঁড়া অসিত। বাবা বেরিয়ে গেলেই চলে যাবো। কিন্তু তা আর বলতে পারলো না।

ওদিকে ঢেঁকিঘরে যেখানে পাতাপুতি, ঘুঁটে থাকে সেখানে নজর করে দেখে ঘুঁটে মাত্র কয়েকখানা পড়ে আছে। খুব ইচ্ছে করছে যেতে। ইচ্ছে করেছে এক্ষুনিই বলে দেয়—বাবা, এখন আর পড়তে ভালো লাগছে না। এক বস্তা ঘুঁটে নিয়ে আসি না! বউদির খুব কষ্ট হবে।

অসিত চলে গেছে। বাবাও চলে গেলেন বাজারে। এখন গিয়ে আর ধরা যাবে না অসিতকে। কোথায় চলে গেছে! আজ কি ও হাওড়ের ব্রিজে যাবে! পাকা রাস্তায় উঠবে? নাকি একা একা বলে অতদূর যাবে না! ঝুলির বাগিচে, দত্তদের মাঠ—মতি মণ্ডলানার
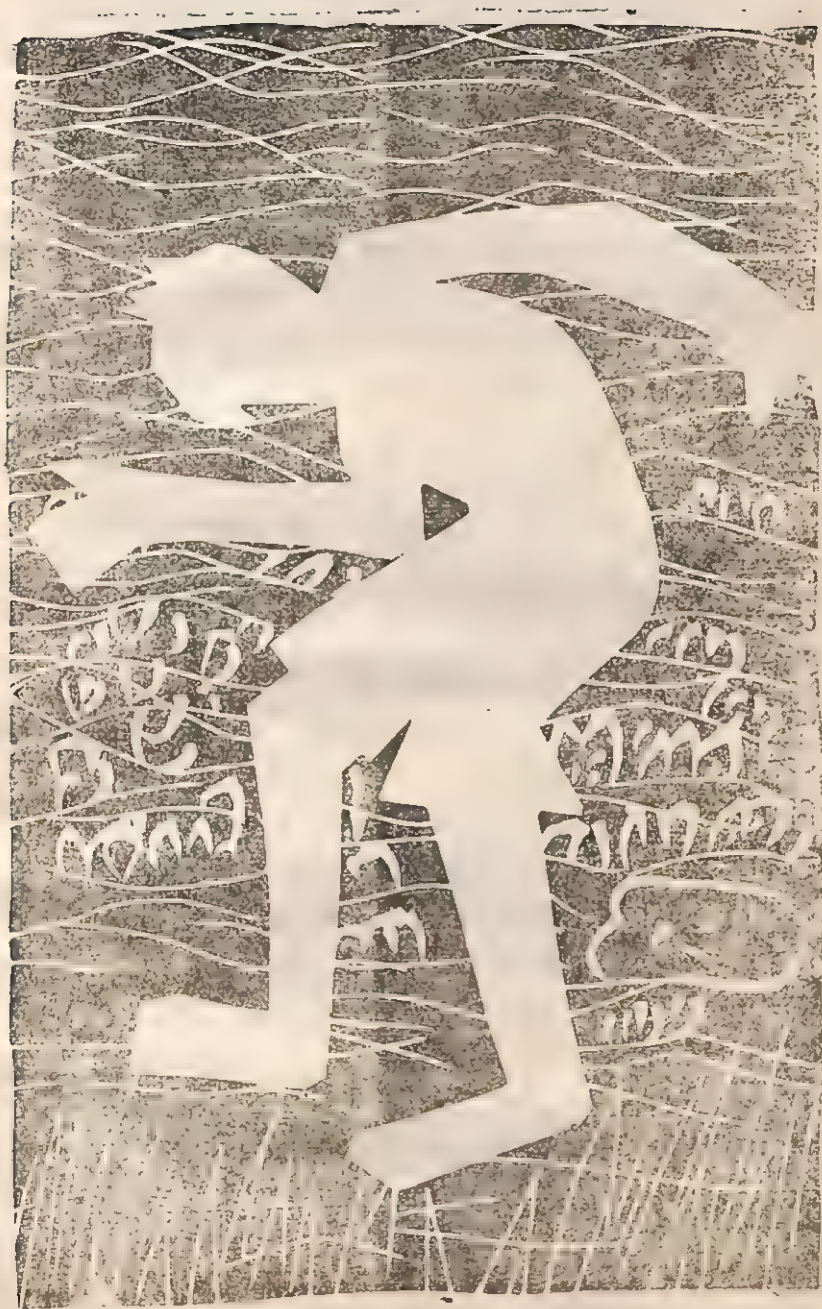
জমিতে ঘুঁটে কুড়োবে। এসব মাঠে কি বেশি ঘুঁটে পাবে অসিত?

আজ রতন একা একাই দোয়ার ঘাটে চান করতে যাচ্ছে। সর্ষে তেল ছিল না। সামান্য যা ছিল তা-ই কেঁখেটেখে মাথায় মেখে যায়। বাবা হাট থেকে সর্ষে কিনে এনেছেন। কলুপাড়া থেকে ভাঙিয়ে আনতে বলেছেন। আসরাম কলু বাবার খুব চেনা। তাঁর ঘানিতেই যেতে বলেছেন। এখানে গেলে পয়সা লাগবে না। আসরাম কলুর বাড়ি কাজ করে শোধ দেবেন বাবা। কাল যেতেই হবে।

সর্ষে ভাঙাতে গেলে ভারি সুখ পাওয়া যায়। ঠুলি-আঁটা বলদের ঘানিতে চেপে বসে থাকতে খুব ভালো লাগে। বলদ দুটো কী সুন্দর ক্যাঁচকোচ শব্দ তুলে ঘোরে। নিচে কাঠের নল দিয়ে মাটির ঠিলেয় তেল জমা হয়। মাঝে আসরাম কলু কিংবা তাঁর ছেলে এসে তদারকি করে যায়। বলে, কী খোকা। ঘুম পাচ্ছে?

ঘানি চেপে থেকে সত্যিই ঘুম পায়। ঠাণ্ডা শনের ঘর। কাল যেতে হবে ওখানে। পড়া শেষ করে স্কুলে যাবার আগে সর্ষে নিয়ে যেতে হবেই। নয়তো রান্না বা চান কোনোটাই করা যাবে না।

ইস, কতো কচুরিপানা। এ যে ঘাট বোঝাই হয়ে গেছে। একপাশে একজন বউ পাট পেতে কাপড় কাচছে। উত্তর দিকে হাওয়া বইছে। ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে রতন। দোয়ার কূল বরাবর ধান গাছের শিস ঢেউ খেলছে। এত কচুরিপানা সরিয়ে আর ইচ্ছে করছে না জলে নামে। কূলে বসে বালির ওপর রতন আঙুল দিয়ে নিজের নাম লেখে। ক্লাশ, রোল নম্বর। তারপর থাবা দিয়ে মুছে দেয়। মাটিতে কিছু লিখতে নেই. তাহলে মা সরস্বতী রাগ করেন। কিন্তু সামনের কচুরিপানা⋯। ধুস, একবার নিজের মনে বল করে কচুরি সরিয়ে দেয়। তবু কি যেতে চায়। ওদিকে হাওয়ার জোরে জমাট বেঁধে যাচ্ছে বুঝি। রতন এক এক করে কচুরির ধাপ কূলে তুলতে থাকে। তুলতে তুলতেই—আরে! কাঁকড়ার বাচ্চা দৌড়চ্ছে! রতন খপ করে ধরে ফেলে। দাঁতঅলা দুটো কাঁটা ভাঙতে গিয়ে কাঁকড়াটা

কামড়ে দিল। কোনো রকমে মট্ করে ভেঙে কোমরে গোঁজা গামছার থলিতে রাখে। ইস, এই সময় যদি অসিত থাকতো তাহলে রতন বুকসমান বা ডুবসাঁতার জল থেকে কচুরি খুব আস্তে আস্তে কাঁকড়া বা চুনোমাছ একদম টের না পায়, তেমনভাবে টেনে এনে অনেক মাছ ধরতে পারতো। এমনকি কূলের কাছাকাছি গামছা দিয়ে মাছ ধরতে কিছুই কষ্টের ছিল না। অসিত কি এখনো ঘুঁটে কুড়োচ্ছে? যদি কুড়োয়, তাহলে একা একা ঝুলির বাগানের পাশে শনের ভুঁইতেই হয়তো আছে। বেশি দূর যায়নি। যদি না যায় তাহলে কি আজ ও স্কুলে যেতে পারবে? স্কুলে গেলে অসিতকে একটা জিনিস দেখিয়ে চমকে দেবে। কেন না, ওকে জানানো হয়নি গেল হাটে সে একটা জিনিস কিনে এনেছে।

পাশের বউটি এতক্ষণ সেদ্ধ কাচছিল মুখ দিয়ে হুস হুস শব্দ তুলে। কিন্তু তার কাচা শেষ। এবার চান করছে। নিশ্চয় এবার বাড়ি যাবে। গেলে দোয়ার ঘাট একদম ফাঁকা। কেউ থাকবে না। না থাকলে একা একা ভয় করবে রতনের। কেননা এই দোয়ায় নাকি ছুটো জ্যান্ত জালা আছে। শীতের দিনে পাড়ে উঠে রোদ পোয়ায়। গল্প শুনেছে, এই জালা ছুটো নাকি দাশদের ছিল। দাশরা খুব বড়লোক ছিল। ওর মধ্যে তারা টাকা-পয়সা রেখে দিত। একদিন স্বপ্নে দেখে যে, আদেশ করে জালা ছুটো বলছে—আমরা আজ থেকে বড়ো দোয়ায় থাকবো। বছর বছর গঙ্গাপুজোর দিন ঘাটে পুজো দিবি।

সবাই বলে ওই জালা ছুটো দাশদের যক্ষের ধন। সেই রাত্তিরেই নাকি জালা ছুটো ঘরঘর ঘরঘর করে এই ঘাট দিয়ে জল নেমে যায়। আর ছুটোরই গলায় শিকল পরানো।—সেই দাশদের ঘাট। এই ঘাটে ছুপুরবেলা একা একা চান করা ঠিক নয়। জলে নামলে যদি শিকল দিয়ে টেনে নিয়ে যায়? এই কথা মনে হতে সত্যিই ভয় পেয়ে রতন খপ খপ করে জল ছিটিয়ে উপরে উঠে এলো। পাশের

বউটি জিজ্ঞেস করে—কীরে, কী হলো? অমন দৌড়ে উঠে এলি কেন?

রতন বলে, কিছু না। এমনিই।

এতো গরম দিয়েছে না! গাঙকূলের ভাটিগাছগুলোর পাতা একদম নেতিয়ে আছে। গাঙেও জল নেই। রাস্তার পাশে বেলগাছে একটা পাতাও চোখে পড়ে না। শুধু ডালপালার ভেতর পাকা বেল ঝুলে আছে। একটু ঝড়ের হাওয়া দিলেই টুপটাপ পড়ে। শান-বাধানো পিঁড়িতে পড়ে ফেটে যায়। আজ স্কুলে যাবার পথে দেখে তেমনভাবেই একটা আধফাটা বেল পড়ে আছে। রাস্তায় কেউ নেই, তবু রতন এক দৌড়ে সেটাকে তুলে আনে। নিয়ে কোথায় যাবে? সঙ্গে করে তো নিয়ে যাওয়া যাবে না। গাছপাকা বেলের মায়াও ত্যাগ করা যায় না। তাই স্কুলের পথে ফুকমের পাশে পাতাপুতি দিয়ে ঢেকে তবে স্কুলে যায়। কবে যে গরমের ছুটি পড়বে!

গাছের আম পাকতে শুরু করেছে। গেল হাটে পাকা আমের ঝুড়ি দেখেছে সে। সেইসঙ্গে আমের গুটির সিজিন চলে গেলেও নতুন রকমের মকরমাছ-মার্কা আমকাটা ছুরি দেখতেই হাতখরচার পয়সা দিয়ে কিনে নিল রতন।

ছুরি, চাকু স্কুলে নিয়ে যাবার নিয়ম নেই। তবু আজ সে লোভ সামলাতে পারলো না। কোমরের ঘুনসিতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যদি ধরা পড়ে তাহলে ছুরি জমা পড়ে যাবে হেডস্যারের কাছে। সেই সঙ্গে রোদের মাঝে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি। এসব জানা সত্ত্বেও রতন নিয়ে যায়। এই ছুরি দেখাতেই হবে। টিফিনবেলা কিংবা

ছুটির পর বন্ধুদের দেখালে বলবে—কার কাছ থেকে কিনেছিস, রতন ? কোথায় পাওয়া যায় ? দাম কত ?—কী সুন্দর ছুরি ! একটু আম কাটতে দিবি ?

অসিতটা আজ নেই। আচ্ছা, আজ না গেলেই কি চলতো না ? একই সঙ্গে তো ঘুঁটে কুড়োয়, পাতাপুতি কুড়োয়। দু'একদিন চলার মতন কি ছিল না ?

এখনও এগারোটা বাজেনি। বলা যায় না, এর মধ্যে চলেও আসতে পারে অসিত। যদি এসে যায় তাহলে অসিতের কাছে পাস করে দেবে ছুরিটা। অসিতের কাছে থাকলে চট করে কেউ স্যারের কাছে নালিশ করতে সাহস পাবে না। তখন দেখিয়ে দিতে পারবে। দেখিয়ে-টেখিয়ে বলবে, রেখে দে রতন। কাউকে দিবি না। আজ সোমনাথদের গাছে কাঁচামিঠে আম কেটে বউনি হবে ছুরির।

সতীশ স্যার ক্লাশে ঢুকছেন। নিতাই মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়ার পর স্যার রতনকে খুব ভালো করেই চেনেন। এই স্যার ছুরির কথা জানলেও কিছু বলবেন না। শুধু একটু বকাবকি করবেন। স্যারে ক্লাশে ঢোকার পর শান ছেড়ে সবাই উঠে দাঁড়ায়। স্যার বসতে বলার পর বসার সময় ঠক করে কী একটা শব্দ হলো। ক্লাশের ক্যাপটেন নির্মল রতনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ বাদে বলে—অ্যাই রতন, কিসের শব্দ রে ? চাকু এসেছিস ? —সকলের মাঝে এইভাবে নির্মল কথাটা বলে ফেলবে ভাবতেই পারেনি। রতন আমতা আমতা করে।

—তার মানে···স্যার···

—এই নির্মল, শোন। ছুরি আমার না। অসিতের। ও এলে জিজ্ঞেস করিস। অসিত আমার কাছে রাখতে দিয়েছে।

নির্মল একটু চিন্তা করলো। তার মধ্যে রতন আবার বলে, তাহলে তো নালিশ জানাতে পারবে না। নিজের না হলে তো বলে দেবার নিয়ম নেই।

স্যার বলেন, কীরে, কিসের সলাপরামর্শ করছিস ? নির্মল, হাতের লেখার খাতা তোল।

খুব বাঁচা বেঁচে গেল রতন। নির্মল অবশ্য এ নিয়ে দ্বিতীয়বার কোনো কথা বললো না। অন্যের ছুরি বলে ? নাকি অসিতের ভয়ে !

হাতে পাকা বেল। খালি পা। হাতাঅলা গেঞ্জি গায়ে রতন স্কুল থেকে ফিরছে। রাস্তায় খুব ধুলো হয়েছে। পায়ের পাতা ডুবে যায়। পা দিয়ে ধুলো ছিটিয়ে রতন গরুর গাড়ির পিছন পিছন মাঝ রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরে। সামনেই বটতলা। বটতলা এলে গাড়ি থেকে বই-স্লেট তুলে টিউবওয়েল পা দুটো ভালো করে ধুয়েটুয়ে বাড়ি যাবে। আকাশে রোদের তেজ তেমন নেই। একটু বাদেই বিকেল হবে। বাড়ি থেকে খেয়ে বটতলায় ডুগডুগে (হাডুডু) খেলতে আসবে। আসার পথেই কয়েকজনকে দেখা গেল। অসিতও ওর ভেতর রয়েছে। ও আজ কথা বললো না। পাশ দিয়ে চলে এলো। না বলুক কথা। তার তো কোনো দোষ না। বাবা যেতে দেননি। কিন্তু সে তো মনে মনে যেতে চেয়েছিল। ও আজ নিশ্চয় তার দলে খেলবে না। অসিত ভালো-মুখে কথা বললে মকরমাছঅলা ছুরি দেখতে পেতো। শুনতে পেতো নির্মল তার কথা শুনে ছুরির কথা স্যারকে বলে দেয়নি। কেন যে অমন মুখ করে আছে !

গরমের ছুটি পড়লে কলুপাড়ার সঙ্গে ম্যাচ। ডুগডুগে ম্যাচে এবারও জিততে হবে। সঞ্জিৎ কলুপাড়ায় ঘাস কাটতে গিয়ে ম্যাচ দিয়ে এসেছে। জিতলে আয়না-চিরুনি। জেতা চাই। সঞ্জিৎরা খানিক বাদেই আসবে। ও এবার রতন আর অসিতকে হায়ার করে নিয়ে যাবে।
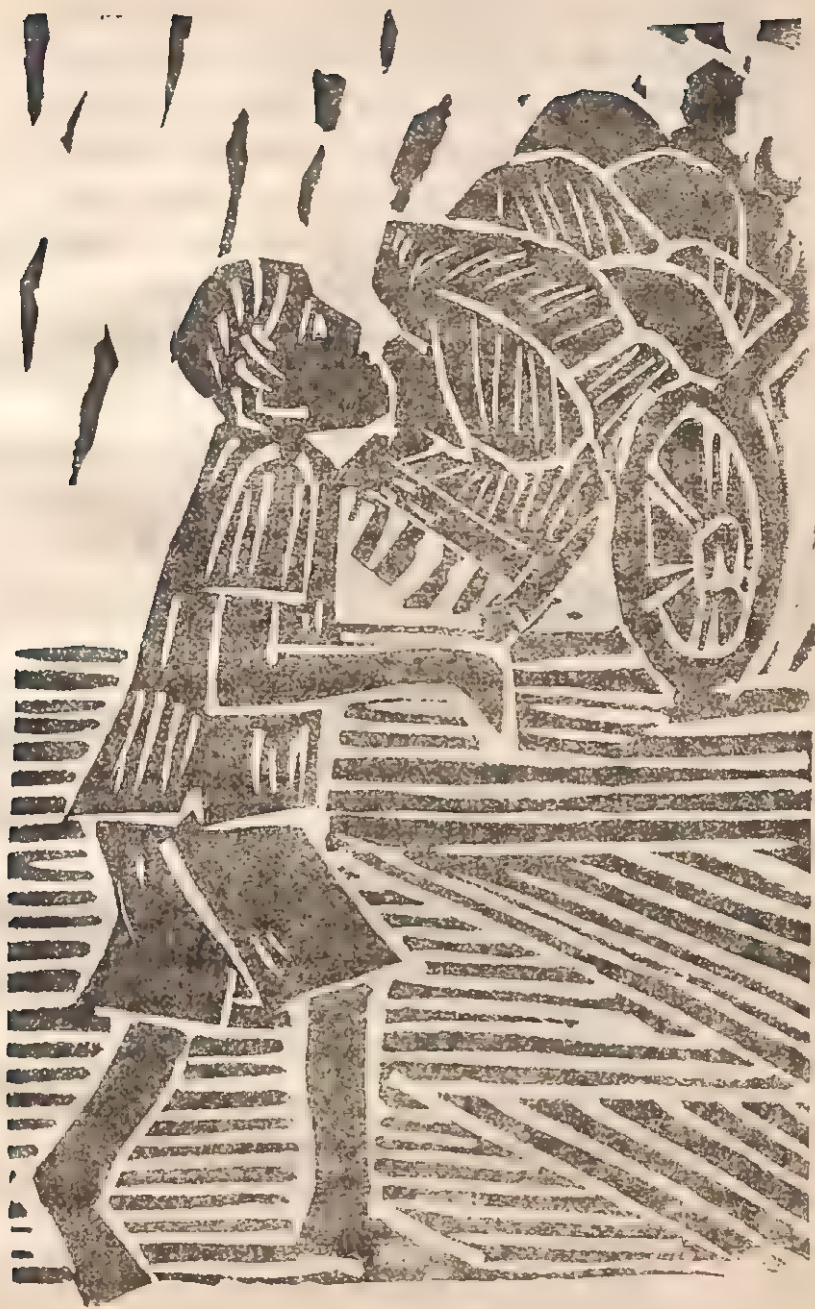
ডুগডুগে খেলায় রতন ইতিমধ্যে বেশ নাম করেছে। রোগা, লিকলিকে শরীর হলে কী হবে, দম আছে রতনের। তা ছাড়া খেড়ি (প্লেয়ার) মারায় দারুণ ওস্তাদ। সীমানায় দাঁড়িয়ে রতন চোখ বন্ধ করে কপালে হাত ঠেকিয়ে মাকে প্রণাম করে নেয়। তারপরই ডুগডুগ···ডা···ডা—আ।—ঠিক মেরে আসবে একজনকে। গতবার ওরাই রতনকে একদম পাত্তা দেয়নি। রতনদের দিকে সকলেই আউট, শুধু রতন বাদে! রতন সীমানায় দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে মাকে প্রণাম করতেই কলুপাড়ার ছেলেরা হো হো করে হেসে উঠেছিল। কিন্তু তারপর একটা বিরাট অঘটন ঘটিয়ে দেয় ওই রতন। সে এক ডুগে তিনজনকে মেরে এসেছিল। এবং সে খেলায় একমাত্র রতনের জন্যই ম্যাচ জেতে সঙ্ঘিৎ। এবার কী হয়, বলা যায় না। কেননা অসিত ইতিমধ্যে রাগ করে বসে আছে। খেলার মাঝে মন-খারাপ থাকা ভালো লক্ষণ নয় একদম।

বাবা বারান্দার কোণে বসে আছেন। হুকো ঝোলানো রয়েছে দেয়ালে। কলকে তুলে এনে উল্টো করে বাড়ি দেন। গুলির মতন ঠিকরিটা বেরিয়ে পড়ে। বাবা বলেন, রতন। কীরে, সন্ধে উৎরে যাচ্ছে। পড়তে বসবি কখন? বৃত্তি পরীক্ষার টাইম তো এসে গেল। ভালোভাবে পাশ করা চাই, বাবা। ভালো রেজাল্ট করে উঁচু ক্লাশে উঠলে আর মাইনে লাগবে না। দরখাস্ত দিলে ফ্রি হয়ে যাবে। পাশ করলে দাদারা খুব খুশি হবে।—ঠিকঠাক পড়তে যাচ্ছিস তো? দেখিস,

কামাই করবি না। তুই বড়ো হলে কষ্ট করা সার্থক হবে। দেখছিস তো কী অভাবের মধ্যেও দাদারা তোকে পড়াচ্ছে। ওদের আশা, আমরা তো মানুষ হতেই পারলাম না। যদি রতনটা একটু লেখাপড়া করতে পারে। মুখ রাখিস বাবা।

রতন হারিকেন জ্বালিয়ে পড়তে বসে। আলোর সামনে বসে একটা বাজে কাগজ ভাঁজ করে হারিকেনের তারে গুঁজে দেয়। বইয়ের লেখা খাতা-কলম বাদে ওর চোখদুটো অন্ধকারে ঢেকে থাকে। ওই চোখেই দেখতে পায় বাবা বারান্দায় বসে ভুড়ুক ভুড়ুক হুকো টানছেন। আজ সন্ধের আগে দোয়ার ঘাটে গিয়ে গা ধুয়ে এসেছে। গা তাই ঠাণ্ডা। ঘাম নেই। বাইরে গাছপালার শব্দ তুলে হাওয়া বইছে। ডুগডুগে খেলায় খুব খাটনি গেছে। এখন চানটান করে এসে পড়ার সময় খালি ঘুম পাচ্ছে। পড়তে গিয়ে পড়া জড়িয়ে আসছে। বাবা বলেন, কীরে, ঘুমোচ্ছিস নাকি ?

—কই, না তো।

বেশিক্ষণ পড়া যাচ্ছে না সত্যি। আবার ঘুম পাচ্ছে। রতন অন্ধকারে চুপিচুপি চোখ তুলে দেখে বাবা এখনও বসে আছেন। বাবা আর কতক্ষণ থাকবেন ?

রাত্তিরে আজ তাড়াতাড়িই বউদি খেতে ডাকছেন রতনকে। বাবা গেছেন পাঁচুগোপালের বাড়ি রেডিও শুনতে। বাবা ওই বাড়ি রাত আটটায় আকাশবাণীর খবর শুনতে যান। বাবা নানারকম গল্পটল্প করে পাঁচুকাকার বারান্দায় বসে খবর শোনেন। খবরের পর পাঁচ রকম আলোচনা হয়। তারপর অন্ধকার রাস্তা দিয়েই বাবা হরেকৃষ্ণ গাইতে গাইতে বাড়ি ফেরেন। ফিরে বউদিকে বললেন—বউমা, খেতে দাও। আজ এই কথা বলার আগেই বউদি বলেন, বাবা, খেয়ে যান।

আজ রতনের দিকে চোখ তুলে বললেন, কী ব্যাপার, শয়তানের চোখ লাল কেন ? ও কি ঘুমোচ্ছিল ?

বউদি কোনো কথা বলেন না।

—ঠিক আছে, খেয়ে নে। তারপর দেখাচ্ছি। মাথায় পুঙ্গিমান পড়া, আর বাবুর ঘুম দেখো! কপাল ভালো খেতে বসেছিস, নয়তো—

বউদি তাড়াতাড়ি রতনের কাছে চলে আসেন। চুপিচুপি বলেন, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। আমি বলে দেবো আজ আর কিছু বলবেন না।

রতন বাবার কথা শুনে খাওয়া থামিয়ে দিয়েছিল। এই কথা শোনার পর আবার খেতে শুরু করল।

বাবা খেতে খেতে বলেন, কেন অমন দুষ্টুমি করিস? একটু মন দিয়ে পড়াশুনো করলে কতো সুন্দর হয় বলতো? আমিই বা রোজ রোজ গায়ে হাত তুলবো কেন? তুই বড়ো হচ্ছিস না? তোর দেখাদেখি কানাই তো শিখবে এরপর। তুই ওকে পড়াবি। তোকে কতো মানবে। তারপর বাবা কথা পাল্টে বললেন—বউমা, মনে আছে তো?

—কী বাবা?

বাঃ, এর মধ্যে ভুলে গেলে? কানাইয়ের মুখে-ভাতের দিন এসে গেল না?

—হ্যাঁ বাবা। এসে তো গেল।

—তবে? কত কাজ বাকি। তোমার বাপের বাড়ি লোক পাঠাতে হবে। আর তো টাইম নেই। কালিদাসকে খবর দিতে হবে ও যেন এক সপ্তার ছুটি নিয়ে আসে।—তোমার মনে নেই, আমি কিন্তু একটা জিনিস করাতে দিয়ে এসেছি। দাদুভাইয়ের জন্য বিছেহার বানাতে দিয়েছি। রুপোর জিনিস। তা-ও কি কম খরচা হবে? দিন দিন সোনার মতনই দর বেড়ে যাচ্ছে। আর দেরি করলাম না। না হোক কিছু তো দিতে হবে ওদিন! লোকজন বেশি বলা যাবে না। পাড়ার ক'জন, রতনের বন্ধু আর তোমাদের বাড়ির লোক। ব্যস। আর পারবো না বউমা!

ঠিক আছে বাবা। বউদি বলেন, বেশি কিছু দরকার নেই।

বউদিকে এসময় খুব খুশি দেখায়। রতনের কাছেই বসে আছেন

বউদি। বলেন, তুই কী দিবি, রতন ?

রতনের চোখে এখন ঘুম নেই। কেমন কথা বলে দিলেন বউদি। সত্যিই তো, বাড়িতে অনেক লোকজন আসবে। কানাইয়ের রুপোর বিছে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবে—কে দিয়েছে, সুন্দর মানিয়েছে তো। তারপর তার কথা বলে যখন বলবে—ওর মণিকাকা কী দিয়েছে ? —তখন ?

রতনের আজ ঘুম আসছে না। বউদি পাশের ঘরে কানাইকে নিয়ে শুয়ে পড়েছেন। কানাই ঘুনঘুন কান্না করছে! ঘুমচোখে বউদি ওকে তাড়া দিচ্ছেন, ঘুমোও। পাজি কোথাকার। দু'দিন বাদে মুখে-ভাত এখনও দুধু খাবার বায়না।

রতন অন্ধকারে চোখ মেলে রয়েছে। ঘর, ঘরের ছাদ, টিনের চাল পর্যন্ত খালি অন্ধকারে বিজ বিজ করছে। হঠাৎ করে মনে পড়ে বকুল ফুলের কথা। বুনোপাড়ার ছেলেমেয়েদের মতন যদি রোজ সকাল-বিকেল ফুল কুড়িয়ে লতায় পরিয়ে মালা গেঁথে ওদের মতন সিনেমাহলের সামনে বিক্রি করা যায় তাহলে তো অনেক পয়সা হবে। তাছাড়া এখন থেকে যেসব হাত-খরচার পয়সা পাবে তা আর খরচা নয়,—সব জমিয়ে ফেলবে। পশ্চিমঘর কিংবা রান্নাঘরের বাঁশের খুঁটিতে পয়সা জমিয়ে রাখলেও একটা জিনিস দেওয়া যাবে কানাইকে।

খুব ভোরবেলা রতন বাবার পাশ থেকে উঠে খিল খুলে ছোট্ট ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ভোরের বাতাস কী ঠাণ্ডা! আমতলার রাস্তায় দোয়েলপাখি কেঁচো খুঁটে খাচ্ছে। হরেকেষ্টর মা গোবর-ছড়া দিচ্ছেন। রতনকে দেখে বলেন, কোথায় যাচ্ছিস রে এত ভোরে ? —আম কুড়োতে ?

রতন কিছু না বলে সাঁ সাঁ এগিয়ে যায়। রবিদের কুটির, মাঝদাই আমতলা পেরোতেই কী সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে বাগান দিয়ে। নিশ্চয় বকুলতলা সারারাত ফুল পড়ে বিছিয়ে আছে। দু'হাতে শুধু কুড়িয়ে যাওয়া। ব্যাগভর্তি করে রবিদের কুটিরবাড়ির বাবলাতলায় দোয়ার দিক মুখ করে বসে মালা গেঁথে রোজ রেখে দেবে। বিকেলবেলা বেড়াতে বেরোনোর নাম করে রোজ সিনেমাহলের সামনে মালা বিক্রি করতে হবে। কেমনভাবে বলবে? রতন নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। বাগানে ঢুকতে ঢুকতে বলে, মালা চাই, মালা? ভালো বকুল ফুলের মালা আছে।

এতক্ষণ ধরে যা ভাবছিলো তার অনেকটাই সত্যি। অতো না থাকলেও বেশ ফুল পড়ে আছে তলায়। রতনের খুব আনন্দ হয়। তাড়াতাড়ি কুড়োতে হবে। বাগানে এখনো আবছা অন্ধকার। ছোট্ট গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে ভোর আসছে। রতন ফুল কুড়োয় আর হাত নাকের কাছে শোঁকে। আঃ, হাতটা ফুলের গন্ধে ভরে যাচ্ছে। এই সুন্দর গন্ধঅলা ফুল কতো বিক্রি হবে? তাড়াতাড়ি করে কুড়নো ভালো। এর মধ্যে যদি বুনোপাড়ার ওরা এসে যায়, কুটে, বেঙি— এরা কী বলবে? কী আর বলবে, এ তো বাবুদের গাছ। সে কি জানে না? ফলে গাছের ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে রেহাই পাবে না। কিংবা যদি বলে আমরা এই মালা বিক্রি করে বাজার করে আনি। আজ তুই এসেছিস কেন? রতন তখন বলবে, আমরাও খুব গরিব রে, কুটে। আমরাও একবেলা ভাত খেতে পারি না। ঘুঁটে কুড়োই, পাতাপুতি কুড়োই। দীপুদের ধান ভাঙিয়ে দিই। আমার বড়দা বাড়ি থাকেন না। বাবার অসুখ। ক'দিনের জন্য কুড়োতে দে। আর আসবো না।

বকুল ফুলের মালা গেঁথে বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেল। আধ-ব্যাগ কুড়িয়েই রতন কুটিরের পাশে বাবলাতলায় বসে অনেকক্ষণ ধরে মালা গাঁথলো। বাড়ি ফিরল যখন, তখন ফেনাভাত খাওয়া

হয়ে গেছে।

স্কুল থেকে রতন আজ একটু আগেই ফিরলো। অন্যদিন ছুটির

পরেও ফিরতে অনেক দেরি হয়। আসার পথে কোথাও দাঁড়িয়াকোট খেলা কিংবা কালাসাধুর গাছে কামরাঙা বা বাতাবিলেবু খেয়ে গল্পগুজব হাসতে হাসতে, কোনোদিন হয়তো মারামারি করে কাঁদতে কাঁদতে রতন বাড়ি ফেরে। আজ সে সব না করে সোজা বাড়ি চলে এলো। তাড়াতাড়ি আসার পথে দীপু বললো—কীরে রতন, আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি যাচ্ছিস যে!

—দরকার আছে।—কী দরকার তা খুলে বললো না সে। অসিতও পাশাপাশি আসছিল, কিন্তু ওর সঙ্গে সেই থেকে কথা নেই। কোনো আড়ি হয়নি। এমনিই বলে না। অসিতও বলে না, রতনও বলে না।

দীপু বলছিল, কীরে, শুনলাম তোদের মধ্যে নাকি আড়ি হয়ে গেছে?

রতন বলেছিল, না তো।

—তবে কেন কথা বলিস না?

—জিজ্ঞেস কর।

অসিত পাশাপাশি যেতে যেতে বললো, আমার বয়েই গেছে।

এই কথা শুনে রতনের খুব খারাপ লাগলো।

দীপু বললো, আগে তো দেখতাম দু'জনে গলায় গলায় বন্ধু।

দীপু খোঁটা দিচ্ছে। দিক। কিন্তু ওর কথা তো মিথ্যে নয়। আরো কথা হতো, কিন্তু রতন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল। ম্যাটিনি

শো ভাঙবে সেই ছ'টায়। খেয়েদেয়ে মাইল তিনেক রাস্তা, তবেই সিনেমাহল। বেশি দেরি করা যাবে না। সেই সকাল বেলায় মালা গেঁথে লুকিয়ে রেখে এসেছে। এখন কী অবস্থায় আছে, কে জানে?

অসিতটার জন্য খুব খারাপ লাগছে। সেই ঘুঁটে কুড়িয়ে ফেরার পথে বুনোপাড়ায় জল খাবার কথা বললে রেগে চলে গিয়েছিল। এই বকুলতলার পাশ দিয়ে আসতে তার মনে হয়েছিল কথাটা। মনে হয়েছিল তারা দু'জন বকুল ফুলের মালা গেঁথে বিক্রি করবে। সেই পয়সায় দু'জনের পকেট-খরচা চলে যাবে। সেদিন ফিরেও তাকায়নি অসিত। আজ একা একা যেতে তার খুব খারাপ লাগছে। অসিত থাকলে বেশি আর ভালোভাবে বিক্রি করা যেতো। সবচেয়ে বড়ো কথা, আজ এমন একটা শুভ কাজে যাচ্ছে, একা একা। অসিত নেই।
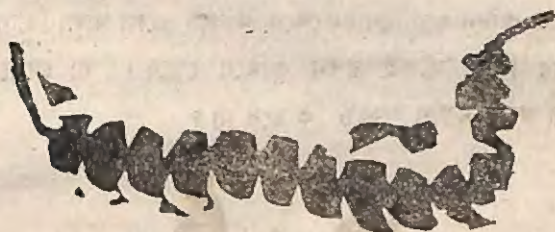
বাবা আজ রুপোর বিছে বাড়িতে এনেছেন। এনে বউদিকে বললেন, কী, পছন্দ? ওর মানাবে না, বউমা?

বউদি সঙ্গে সঙ্গে মটর ডালের মতন রুপোর দানাঅলা বিছেহার কানাইয়ের কোমরে পেঁচিয়ে দেন। হাসতে হাসতে বলেন, খুব ভালো হয়েছে, বাবা।

আর বেশিদিন নেই। সামনের মঙ্গলবারেই কানাইয়ের অন্নপ্রাশন। রুপোর বিছে পেয়ে সকলেই খুব খুশি। রতন বাবাকে জিজ্ঞেস করে, কতো নিয়েছে বাবা?

—কেন, তুই কিনবি নাকি?
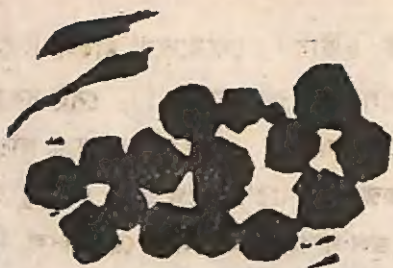
—না না। এমনিই জানলাম।

এই কথা বলার পর যখন বারান্দায় বা উঠোনে কেউ নেই, তখন রতন দা এনে পশ্চিমঘরের খুঁটি কাটে। ঠুক ঠুক। কাটে আর এদিক ওদিক তাকায়। কাটার শব্দটা বেশি হলেই দাঁতমুখ চেপে ধরে শব্দ শুষে নেয় বুঝি। আর একটু। ওই তো পয়সা দেখা যাচ্ছে। কতো হয়েছে?—কতো জমতে পারে এ ক'দিনে? কেননা আজ কদিন ধরে, যেদিন থেকে মাথায় এলো মালা বিক্রির কথা, তার পরের দিন থেকেই রতন জমিয়ে গেছে। যা জমেছে তাতে কানাইয়ের জন্যে একটা আঙটি কি হবে না?

আজ সেই মঙ্গলবার। বাড়িতে অনেক লোকজন আসবে। সেইজন্য বউদি খুব ভোরবেলা ছড়া-ঝাঁট দিয়েছেন। পাশের বাড়ি থেকে হাঁড়ি কড়াই চেয়ে এনেছেন বউদি। বাবা বলছিলেন, খুব শখ

ছিল দাদুভাইয়ের জন্যে ব্যাণ্ডপার্টি আনবো। রিক্সা করে টোপর মাথায় দিয়ে কালীবাড়ির ঠাকুরমশাইয়ের কাছ থেকে প্রসাদ দিয়ে আনবো। কিন্তু সেসব কিছুই হলো না।

বড়দা এখনো আসেননি। আজই আসার কথা। বেশিদিন ছুটি পাননি বড়দা। মাত্র দুদিন। দুদিন তো দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়। বড়দা এলে এবার ঠিক জিজ্ঞেস করবে—আর কতোদিন ধরে দোকানে কাজ করতে হবে?

অসিতকে বাবা নেমন্তন্ন করে এসেছেন। ওর মাকে গিয়ে বলে এসেছেন মঙ্গলবার দুপুরে অসিত দুটো খাবে। কানাইয়ের মুখেভাত। ওর মা বলেছেন পাঠিয়ে দেবেন।

বেলা বাড়ছে। খুঁটি কেটে তিনটাকা চার আনা পেয়েছে রতন। তাই নিয়েই একা একা চলে যায়। বড়ো গাঙকূলে সিনেমা-হলের পাশে স্যাকরার দোকান। যেখান থেকে রতনের বাবা কানাইয়ের জন্য রুপোর বিছে এনেছেন। ওই দোকানের মালিকের মোটা গোঁফ। রতনকে দেখে বলেন, কী চাই?

রতন হাতের মুঠোয় আনা পয়সাগুলো ঢেলে দিয়ে বলে, একটা আঙটি দিন তো! ছোট্ট আঙটি।

দোকানদার আবার তাকান রতনের দিকে। পয়সাগুলো তুলে রতনকে বলেন, হাত পাতো।

রতন হাত পাতে। কিন্তু ফেরত দিচ্ছেন কেন? সে তো ফেরত চায়নি। আঙটি চেয়েছে। ছোট্ট আঙটি। ছোট্টটি হলেই কানাইয়ের আঙুলে লেগে যাবে।

দোকানদার বললেন, বাড়ি যাও। ওতে হবে না। আর আঙটি কিনতে হলে তোমার বাবাকে সঙ্গে এনো।

রতন ফিরে আসে। তার খুব খারাপ লাগে। কতোদিন ধরে রোজ সকালে গিয়ে বকুল ফুল কুড়িয়ে মালা গেঁথে সিনেমাহলের সামনে দাঁড়িয়ে 'মালা চাই, মালা' বলে বিক্রি করেছে। আজ সেই কষ্টের পয়সা

ফেরত দিয়ে দিলেন। আর বললেন বাবাকে আসতে। কেন, বাবা আসার কী আছে? সে তো বড়ো হয়েছে।

অসিত এখনো তাদের বাড়ি আসেনি। বউদি বললেন, যা অসিতকে ডেকে আন। অনেক কাজ আছে। কলার পাতা কাটতে হবে।

কিন্তু বউদি যে বলেছিলেন, তুই কী দিবি রতন? আজ তো সেই দিন। বউদি কি ভুলে গেছেন সেই কথা? যদি যান তাহলে খুব ভালো হয় কিন্তু।

রতন তো অসিতের সঙ্গে আড়ি করেনি, ফলে সে-ই চলে যায় হাঁটতে হাঁটতে। 'অসিত আয়। পাতা কাটতে হবে।'

অসিতও বুঝি এটাই আশা করেছিল। এই ডাক শোনার পর ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে রতনের হাত দুটো চেপে ধরে। বলে, তুই রাগ করিসনি তো, রতন?

রতনের গলাটা ধরে আসে। কান্না এসে গেছে। অসিতের সঙ্গে যেতে গিয়ে বলে, ওরে না। তাহলে আর বন্ধু বলেছে কেন?